মানুষী কথা

দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ ও সপ্তম যুগ্ম সংখ্যা জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

প্রসঙ্গ তিন তালাক
সুপ্রিয় রায়চৌধুরী ৩

নারী চেতনা : কিছু আলোচনা
স্বপন মুখোপাধ্যায় ১০

মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস ও অর্থনীতি
প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায় ১৩

ছোটগল্প
ভক্তিপদ দে ২০

হেদুয়া কাইট, দিলীপকুমার ও এক চিলতে আকাশ
অময় দেব রায় ২৮

হাসপাতালে বসে বসে...
প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরী ৩০

সম্পাদক ও প্রকাশক :
প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক : সুতপা দেব

সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষে :
কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, জয়ন্তী ভট্টাচার্য, শ্রাবণী সরকার নিয়োগী, কৃষ্ণা দাস, টিঙ্কু খান্না

মুদ্রণ : অপটিমা, ৪ নবীন পাল লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা ৭০০০৮৫ থেকে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ শিল্পী : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সংগ্রহ : শিবাদিত্য দাশগুপ্ত

বিনিময় ৩৫ টাকা

সম্পাদকীয়

বেশ কিছু দিন ধরেই কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা একটি আলোচনার বিষয়। সংগঠিত ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের গাইড লাইনে কমপ্লেন্টস্ কমিটি আছে অনেক জায়গাতেই কিন্তু অসংগঠিত ক্ষেত্রে এখনও প্রায় কিছুই নেই। ২০১৩ র আইনে লোকাল কমপ্লেন্টস্ কমিটির কথা বলা হলেও তা প্রায় কোনও জেলাতেই এখনও গড়ে ওঠেনি।

তাই গৃহ পরিচারিকা যখন যৌন অত্যাচারের শিকার হন তাঁর কর্মস্থলে, নালিশ জানাবার জায়গা খুঁজে পান না। পুলিশে জানালে অন্য অনেক বিষয়ের মতো পুলিশ নালিশ নিতে চায় না, দায় এড়িয়ে যায়। ছোট কারখানায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদের অবস্থাও তথৈবচ। অথচ সংগঠিত ক্ষেত্রের তুলনায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা বেশি অসহায়, তাঁদের যে কোনও ভাবে ব্যবহার করা হয় বা তাঁরা নিজেরাই ব্যবহার হয়ে যান। এই নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তির কোনও ব্যবস্থা নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অবস্থার অবসান প্রয়োজন। গড়ে তোলা প্রয়োজন লোকাল কমপ্লেন্টস্ কমিটি।

রমা রায়চৌধুরী বক্তৃতামালা শুরু হবে

ঠিকানা থেকে বলবেন **মালা ঘোষ**

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, বিকেল ৫টা

শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রিসোর্স সেন্টারে

মানুষীর বইঘর-এর উদ্যোগে

আর এ ৪৪৯, সল্টলেক, চিংড়িহাটা

PEST CONTROL CORPORATION OF INDIA
PCCI

Kamalakanta Bhattacharjee

PEST CONTROL CORPORATION OF INDIA
GOVERNMENT ENLISTED CIVIL AND ELECTRICAL CONTRACTOR

Cleaning & Upkeepment Job ● Pest Control ● Security Service
House Keeping Job ● Gardening & All Kinds of Labour Supplier

P-288 C.I.T. Road, Scheme IV M, Kolkata -700 054, Phone : 89102 44483
E-mail : pcciindia2@gmail.com Phone : 89102 44483

প্রসঙ্গ তিন তালাক

তিন তালাক প্রসঙ্গে ইতিহাস, বিভিন্ন দেশের আইন ও বিতর্ক নিয়ে লিখছেন **সুপ্রিয় রায়চৌধুরী**

শাহবানু থেকে সায়রা বানো একটি ঐতিহাসিক যাত্রা। ১৯৮৬ সালে তালাক প্রাপ্ত শাহ বানু খোরপোষের অধিকার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন। সুপ্রিম কোর্ট, খোরপোষের স্বপক্ষে রায় ঘোষণা করে। কিন্তু মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠন বিরোধীতা করলে তৎকালীন পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৬ সালে Muslim Woman (Protection of Rights on Divorce) Act. প্রণয়ন করে ভরন পোষণের অধিকার হরণ করেন। যদিও পরবর্তীকালে ফৌজদারী আইন বলে তালাক প্রাপ্ত মুসলিম মহিলারা ভরন পোষণ আদায় করতে পারছেন।

সম্প্রতি তিন তালাক (তালাক-ই-বিদ্দত) এর বিরোধীতা করে ''মুসলিম উত্তম্যান'স কোয়েস্ট ফর ইকোয়ালিটি'' নামে একটি সংগঠন এবং কয়েকজন মহিলা যেমন সায়রা বানো, আফরিন রেহমান, গুলশন পারভিন, ইশরদ জাহা এবং আতিয়া সাবরি সহ আরও কেউ কেউ সর্ব্বোচ্চ আদালতে আবেদন করে। এই মামলার মুল বিষয় ছিল তালাক প্রথা ব্যবহার করে মুহুর্তে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে একজন মুসলিম মহিলাকে গৃহচ্যুত, অনিশ্চিত, অসহায়, নিরাপত্তহীন জীবনের দিকে ঠেলে দেওয়া। তাই ভারতের মতন ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে এই প্রথা অনভিপ্রেত, যে দেশে সকল মহিলা ও পুরুষের ধর্ম বিশ্বাস নির্বিশেষে সকলের আইনি সমান অধিকার। এই প্রথা ধর্ম এবং আইন মোতাবেক বৈধ নয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

নবি হজরত যে সময়ে আরবে ঈশ্বরের বানী প্রচার করেছিলেন সে সময় আরবের জনগণ ছিল অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং বর্বর। তারা ছিল বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত যেমন, কন্যাভ্রুণ হত্যা, মদ্যপ হওয়া ইত্যাদি। নবি হজরতই ছিলেন প্রধান এবং সর্ব্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক।

নবি তাঁর জীবৎকালে কে তাঁর স্থলভিষিক্ত হবেন চিহ্নিত করেননি। তাঁর মৃত্যু সংবাদ আবু বকর প্রথম ঘোষণা করেন। নবির স্থানে কে অভিষিক্ত হবেন সেই নির্বাচনের জন্য উপজাতিদের প্রধান বানু খাজবাজ একটি সভার ব্যবস্থা করেন। সেই সভায় আবু বকরই নবীর উত্তরাধিকার রূপে নির্বাচিত হন। এই সিদ্ধান্ত সবাই সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করেন।

এই নির্বাচনই সুন্নি এবং সিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন ঘটায়। কোরিশ উপজাতি বিভক্ত হয়-ওমাইয়াদ এবং হাসিম গোষ্ঠীতে। হাসিম ছিলেন নবীর প্রপিতামহ এবং তাঁর নামানুসারে এই গোষ্ঠীর নামকরণ হয়। কিন্তু এই দুই গোষ্ঠী আবু বকরের নির্বাচনকে সমর্থন করেন। আবু বকর অধিষ্ঠিত থাকাকালীন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খলিফা ওমর এবং ওসমান নির্বাচিত হন এবং আবু বকর তার পুর্নসমর্থন করেন।

সম্প্রতি তিন তালাক (তালাক-ই-বিদ্দত) এর বিরোধীতা করে ''মুসলিম উত্তম্যান'স কোয়েস্ট ফর ইকোয়ালিটি'' নামে একটি সংগঠন

ষাট বছরের আবু বকর দু-বছরের জন্যে খলিফা ছিলেন (৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি যখন খলি ফা ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন ওমর ইবনুল খাট্টাহ্। বলা যেতে পারে আবু বকর ওমরকে তাঁর উত্তরাধিকার রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। যদিও একথা সত্যি নাও হতে পারে। তবে নির্বাচনটি ছিল লোক দেখানো। ওমর দশ বছর খলিফা থাকাকালীন নিহত হন (৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)। ওসমান

তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। পরম্পরানুযায়ী ওমর ছয়জন নির্বাচকের নামের তালিকা প্রকাশ করেন। (যদিও কিছু ঐতিহাসিক এই সম্ভাবনা অনুমোদন করেন না) বরং আব্বাসিদ এই পরম্পরানুসারে আভ্যন্তরীণ ধর্মা সভা নির্বাচনের জন্য গঠন করেন। ওসমান বারো বছরের জন্য খলিফা ছিলেন এবং তিনি নিহত হন। আলি চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন। এই চার নির্বাচিত খলিফা খুলফাই-ইফ রাশে দিন (The Rightly guided caliphs)। আলি পাঁচ বছরের জন্য খলিফা ছিলেন এবং ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে একটি যুদ্ধে নিহত হন। আলির ছেলে হাসান, মুয়াভিয়ার পক্ষে খলিফা পদটি ছেড়ে দেন। মুয়াভিয়া ওমাইয়াদ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। হাসান পরবর্তী কালে নিহত হন। তখন আলির অনুগামীরা আলির দ্বিতীয় পুত্র হুসেনকে মুয়াভি পুত্র ইয়েজিদ এর বিরোধীতা করতে অনুরোধ করে। কারবালার যুদ্ধে অমানুষিক অত্যাচারের ফলে হাসান মৃত্যু বরণ করেন। এই ঘটনা থেকেই সিয়া (সিয়াত-ই-আলি) অর্থাৎ আলির অনুগামী এবং সুন্নি, এই দুই সম্প্রদায়ে বিভাজিত হয়। সিয়া সম্প্রদায় কয়েকটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। যেমন (১) আথনা আসারিয়াস, (২) ইসমাইলিয়াস এবং (৩) জায়াদিয়াস। সুন্নি সম্প্রদায়ও কয়েকটি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। যেমন-(১) হানাফি, (২) মালিকিস, (৩) সফিস এবং (৪) হানবলি।

ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ হানাফি ধারা অনুসরণ করে।

হানাফি ধারা

হানাফি ধারা উক্ত চারটি ধারার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত। আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭) খ্রীষ্টাব্দ এই ধারার প্রতিষ্ঠাতা। এই ধারা কুফা নামেও পরিচিত। আবু হানাফি ছিলেন সিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 'ইমাম জাফর-আস-সাদিক'-র শিষ্য। তিনি আবু-আবদুল্লা ইবন-উল মুবারক এবং হামিদ বিন-সুলাইমনেরও শিষ্য ছিলেন। হানিফা এই পৃথক ধারার প্রবর্তক। খলিফা আব্বাসিদ এই ধারার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই ধারা প্রভূত বিস্তার লাভ করে। আবু হানিফা 'মহান ইমাম' নামে অভিহিত হয়েছিলেন। আবু হানিফা ছাড়া এই ধারার আরও দুজন বিদগ্ধ পন্ডিত ছিলেন-আবু ইউসুফ (বাগদাদের প্রধান কাজী নিযুক্ত হন) এবং ইমাম মুহাম্মদ অসায়াবানি (কয়েকটি আইন এবং দর্শনের পুস্তক রচনা করেন)। এই ধারার উৎপত্তি ইরাক। কিন্তু অন্যান্য ধারার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। অটোমান এবং সেলজুক তুর্কিরা ও হানাফি ছিলেন। এই ধারার শিক্ষা সিরিয়া, আফগানিস্তান তুরস্ক মধ্য এশিয়া এবং ভারতে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়।

মুসলিম বিবাহ এবং বিচ্ছেদ

মুসলিম ধর্মানুযায়ী বিবাহ একটি চুক্তি। নারী এবং পুরুষের সম্মতিক্রমে চুক্তি সম্পাদিত হয়। কোনও বিশেষ কারণে এই বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করা যায়। কিন্তু এই বিবাহের সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় দিক হল এই বিবাহের ক্ষেত্রে কোনও সামাজিক উৎসবের প্রয়োজন নেই। (যদিও বর্তমানে বিবাহের সামাজিক অনুষ্ঠান হয়) তালাক প্রসঙ্গে আসফ এ. এ. ফাইজি বলেছেন —

> আবু হানিফা ছাড়া এই ধারার আরও দুজন বিদগ্ধ পন্ডিত ছিলেন-আবু ইউসুফ (বাগদাদের প্রধান কাজী নিযুক্ত হন) এবং ইমাম মুহাম্মদ অসায়াবানি (কয়েকটি আইন এবং দর্শনের পুস্তক রচনা করেন)।

"The Pronouncement of talaq may be either revocable or irrevocable. As the prophet of Islam did not favour the institution of talaq, the revocable forms of talaq are considered as the 'approved' and the irrevocable forms are treated as the 'dis approved' forms. A revocable pronouncement of divorce gives a 'locus poenitentiae to the man but an irrevocable

pronouncement had to an undesirable result without a chance to reconsider the question. If this principle is kept in mind the terminology is easily understood. The forms of talaq may be classified as follows:-

(a) Talaq al-sunna (i.e in conformity with the dictates of prophet) (i) ahasan (the most approved) (ii) hasan (aaproved).

(b) Talaq al- bid'a (i.e. of innovation therefore not approved)-(i) three declaration (the so called triple divorce) at one time (ii) one irrevocable declaration (generally in writing).

উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে তালাক-অল-সুন্না স্বীকৃত তালাক। এই তালাক দু-রকমের। যেমন (১) আহসান-সবচেয়ে স্বীকৃত এবং (২) হাসান স্বীকৃত তালাক অল বিদাই এই তালাক প্রথা প্রচলিত হয় ওমাইয়াদ রাজত্বে। সেজন্যে এই প্রথার তালাক আইন সিদ্ধ হলেও ধর্মীয় ব্যাখায় সিদ্ধ নয়। এই প্রথার তালাকই ভারতে সর্বাধিক প্রচলিত।

তালাক অল-সুন্না (আহসান এবং হাসান) প্রথার তালাকে স্বামী তিনবার তিনটি ঋতুমুক্ত (তুহর) সময়ে 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করবেন পর্যায়ক্রমে এবং ইদ্দত সময় সীমার মধ্যে। এই সময় সীমার মধ্যে যৌন সংসর্গ হলে এই তালাক বাতিল বলেই গণ্য হবে। ইবনা আসারি এবং ফতিমি ধারায় এই তালাক গ্রহণযোগ্য। যদি স্বামী বা স্ত্রী দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন অথবা স্ত্রীর বয়সজনিত কারণে ঋতুবন্ধ হয় সেখানে তুহর-এর প্রয়োজন নেই।

তালাক অল সুন্না প্রথায় তালাক বাতিল যোগ্য। ইদ্দত সময়ের (তিন মাস) মধ্যে অথবা গর্ভাবস্থায় প্রসব না হওয়া অবধি। এই সময়ের মধ্যে তালাক বাতিল করা যায়, স্ত্রীর সঙ্গে যৌগ সংসর্গ হলে কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের অঙ্গীকার করে। কিন্তু ঋতুমুক্ত সময়ে এক নিশ্বাসে 'তালাক', 'তালাক', 'তালাক' উচ্চারণ করলে সেই তালাক তৎক্ষণাৎ কার্যকরী এবং বাতিল অযোগ্য। উক্ত দুই প্রকার তালাক সিয়া এবং সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ই মান্যতা দেয়। যেহেতু দুই তালাকের প্রত্যেক পর্বেই মীমাংসা করার বিধান আছে। এই দুই তালাক 'কোরান' সিদ্ধ।

তিন তালাক অস্বীকৃত হলেও হানাফি ধারায় এই তালাক গ্রহণযোগ্য কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ এবং অশুভ। এই তিন তালাককে কেউ বলে তালাক অল-বাইন।

তালাক কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে দেওয়া যায়। যেমন (১) স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হন, (২) স্ত্রী যদি সংসার করতে অনিচ্ছুক হন, (৩) স্ত্রী যদি অসুস্থ হন, (৪) স্ত্রী যদি ব্যাভিচারিণী হন।

হানাবলি ধারার বিদগ্ধ পন্ডিত ইবন্ তাহামিয়াহ (১২৬৩-১৩২৮) এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত তিন তালাক একবার তালাকের সমান বলেই বিধান দিয়েছিলেন।

তালাক অল সুন্না প্রথায় তালাক বাতিল যোগ্য। ইদ্দত সময়ের (তিন মাস) মধ্যে অথবা গর্ভাবস্থায় প্রসব না হওয়া অবধি। এই সময়ের মধ্যে তালাক বাতিল করা যায়, স্ত্রীর সঙ্গে যৌগ সংসর্গ হলে কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের অঙ্গীকার করে।

কয়েকটি মুসলিম প্রধান দেশের আইন

আলজিরিয়া ঃ রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। জনসংখ্যার নিরিখে সুন্নি সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠ। ১৯৮৪ সালে 'তালাক' সম্পর্কিত যে আইন প্রণয়ন হয় এবং ২০০৫ সালে সংশোধিত হয়। সেই আইনের ৪৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে

তালাক গ্রাহ্য হবে না তবে তিন মাস সময় সীমার মধ্যে মিমাংসার ব্যবস্থা করা অবশ্য জরুরি।

মিশর ঃ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। জনসংখ্যার নিরিখে সুন্নি সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠ। ১৯২৯ সালে বিবাহ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে এবং ১৯৮৫ সালে সংশোধিত হয়। সেই আইনের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ নীচে আলোচিত হল।

(ক) নেশা গ্রস্থ অবস্থায় অথবা প্ররোচিত হয়ে তালাক দিলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) কোনও কিছু করতে বা কোনও কিছু থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করার শর্তে তালাক তাৎক্ষণিকভাবে কার্য্যকরী নয়।

(গ) একবারেই তিন তালাক উচ্চারিত হলেও তা একবার তালাকের সমান এবং তৎক্ষণাৎ কার্য্যকরী হবে না।

(ঘ) স্বামীর প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশিত না হলে আকার ইঙ্গিতে তালাক স্বীকৃত নয়।

ইরান ঃ রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। জনসংখ্যার নিরিখে সিয়া সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠ। 'তালাক' সম্পর্কিত আইন ১৯৫৯ সালে প্রণয়ন হয়। ১৯৮৭ সালে সংশোধিত হয়। বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণিত আইন নিম্নরূপ—

(ক) কোনও স্বামী যদি নেশাগ্রস্থ, উন্মাদ, অক্ষম ও বার্ধক্যজনিত রোগগ্রস্থ অবস্থায়, প্ররোচিত বা ক্রোধান্বিত অথবা যন্ত্রণা দায়ক অবস্থায় তালাক দিলে সেই তালাক গ্রাহ্য নয়।

(খ) কোনও স্বামী যদি মৃত্যু শয্যায় অথবা মারাত্মক অবস্থায় থাকাকালীন তালাক দেয় সেই তালক গ্রাহ্য নয়।

(গ) আকারে ইঙ্গিতে একবারের বেশি 'তালাক' শব্দ উচ্চারিত হলে সেই তালাক স্বীকৃত নয়।

(ঘ) তিনবার তালাকের ফলে যদি কোনও মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হন সেই তালাক বাতিল যোগ্য নয় এবং পূর্নবিবাহের অনুমোদন নেই।

(ঙ) যদি কোনও স্বামী তালাক দিতে চান তিনি ব্যক্তিগত বিধি অনুসারে তালাকের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আদালতে একটি দরখাস্ত করবেন অথবা যদি তিনি আদালতে না যেতে চান তাহলে তিন মাস ঋতুকালীন (ইদ্দত) সময়ে আদালতে সেই তালাক নথিভুক্ত করবেন যা স্ত্রীর উপর বলবৎ হবে।

(চ) বিবাহের শংসাপত্র (Certificate) যতক্ষণ আদালত বাতিল বলে ঘোষণা না করছে, ততক্ষণ সেই শংসাপত্র আইন সিদ্ধ।

লিবিয়া ঃ রাষ্ট্রের ঘোষিত ধর্ম ইসলাম জনসংখ্যার নিরিখে সুন্নি সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠ। ১৯৮৪ সালে পারিবারিক আইন প্রণয়ন হয়। আইনের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(১) কোনও তালাক আদালতের আদেশ ভিন্ন গ্রাহ্য হবে না।

(২) তালাক দুই প্রকার (ক) বাতিল যোগ্য এবং (খ) বাতিল অযোগ্য। ইদ্দতের সময়সীমা পার না হলে বাতিল যোগ্য তালাক কার্যকরী হবে না। কিন্তু বাতিল অযোগ্য তালাক তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হবে।

(৩) যে কোনও তালাক সহবাসের আগে এবং বিবেচনাধীন সময়ে বাতিল যোগ্য, তিন তালাক ব্যতীত এবং যেগুলি আইনে নির্দিষ্ট সেগুলি বাতিল অযোগ্য হতে পারে।

(৪) স্বেচ্ছায় এবং পরিষ্কার ভাবে উচ্চারিত 'তালাক' গ্রাহ্য হবে কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে দেওয়া তালাক গ্রাহ্য হবে না।

(৫) নাবালক, মানসিক অসুস্থ, প্ররোচিত হয়ে অথবা তালাকের ইচ্ছা প্রকাশিত না হয় তবে সেই তালাক আইনি গ্রাহ্যতা পাবে না।

(৬) শর্ত সাপেক্ষে তালাক আইনি সিদ্ধ নয়।

(৭) যদি কোনও কাজে অসন্তুষ্টি হয় বা দোষ-ত্রুটির জন্য তালাক দেওয়া হয় সেই তালাক অগ্রাহ্য করা হবে।

(৮) বারবার উচ্চারিত তালাক অথবা আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয় সেই তালাক বাতিল যোগ্য বলেই স্বীকৃত হবে।

(৯) দুই পক্ষের সম্মতিতে আদালতের আইনানুসারে গৃহীত হবে। যদি পক্ষগণ সম্মতি প্রদান না করেন তবে আদালতের শরণাপন্ন হলে আদালত একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করবেন যিনি মীমাংসা করবেন।

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ ঃ দুটি দেশেই রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। সুন্নি সম্প্রদায়ই সংখ্যা গরিষ্ঠ। ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন প্রণয়ন হয়। ১৯৮৫ অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশে সংশোধিত হয়।

(ক) কোনও স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারমানকে এবং স্ত্রীকে একটি করে অনুলিপি পাঠাবে।

(খ) যদি কোনও ব্যক্তি উক্ত আইনের অন্যথা করে তবে তিনি একবছরের জেল অথবা পাঁচশ টাকা জরিমানা দেবেন অথবা জেল এবং জরিমানা উভয় রূপে দন্ড প্রাপ্ত হবেন।

(বাংলাদেশে দশ হাজার টাকা জরিমানা)

(গ) উক্ত আইন ব্যতিরেকে কোনও তালাক, যদি বাতিল না হয়ে থাকে, তবে সেই তালাক চেয়ার ম্যান কে অনুলিপি দেওয়ার দিন থেকে ৯০ দিন বাদে কার্যকরী হবে।

(ঘ) উক্ত চেয়ারম্যান অনুলিপি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করবেন এবং তিনি সর্বোতভাবে দুপক্ষের মধ্যের বিবাদ মীমাংসা করার চেষ্টা করবেন।

(ঙ) যদি স্ত্রী গর্ভবতী থাকেন তবে তালাক দিলেও সেই তালাক কার্য্যকরী হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না চেয়ারম্যানকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তি ৩০ দিন শেষ না হয় অথবা সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত।

(চ) এই আইনে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে তার স্বামী পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না, কোনও তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে ব্যতিরেকে, যতক্ষণ না তিন তালাক হচ্ছে।

উক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে ইসলাম রাষ্ট্রে মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য সঠিকভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অথচ ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এ বিষয়ে কোনও অলোচনা করা হয়নি।

শরিয়ত ও তিন তালাক ঃ ১৯৩৭ সালে মুসলিম ব্যক্তিগত (শরিয়ত) প্রয়োগ আইন বা Musilm Personal Law (Shariat) Application Act, প্রণীত হয়। এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় নিপীড়ন, অত্যাচার এবং বৈষম্য মূলক প্রচলিত সামাজিক প্রথার অবসান ঘটানো। এই আইনের ২নং ধারায় মুসলিম বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক তাদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় অনুশাসন মেনেই হবে। কিন্তু তালাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। অপরদিকে ১৯৩৯ সালে মুসলিম বিবাহ এবং বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনে বিচ্ছেদের জন্য কয়েকটি শর্তের উল্লেখ আছে। বরং ১৯৩৭ সালের আইনে বলা হয়েছে তালাক শরিয়ত অর্থাৎ ট্রাডিশন মেনে হবে। 'তালাক' এর শর্ত বা তার পদ্ধতি কি হবে সে বিষয় অনুচ্চারিত। ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্রে এই রকম একটি অনৈতিক এবং বৈষম্য মুলক আইন কল্পনার অতীত। সর্ব্বোচ্চ আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের মতে- "However on the pure question of law that a legislation, be it plenary or subordinate, can be challenged on the ground of arbitrariness."

However on the pure question of law that a legislation, be it plenary or subordinate, can be challenged on the ground of arbitrariness.

যদিও ১৯৬৭ সালের আইনে মুসলিম ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় অনুশাসন এবং প্রথাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল শরিয়ত কি? আসফ-এ এ. ফাইজির মতে "Shariat (lit, the road to the watering place, the path to be followed) as a technical term means the canon law of Islam, the totality of Allah's

commandments. Each one of such commandments is called 'hukm' (Pl ahukm). The law of Allah and its inner meaning is not easy to grasp: and the shariat embraces all human activities. For this reason it is not 'law' in the modern sense, it contains an infallible guide to others..... According to shariat religious injunction are of five kind, al-ahkam al-khamsah. Those strictly enjonined are 'farz' and those stricly forbindden are 'haram'. Between them we have two middle catagories, namely. things which are advised to do (mandub), and things which are advised to refrain from (makruh) and finally there are things about which religion is indifferent (jaiz)' শরিয়ত সমস্ত মানবিক কর্ম, গুণ এবং সত্তার প্রতিফলন। উক্ত পাঁচটি শর্ত বা অনুশাসন সঠিক ভাবে অনুধাবন না করতে পারলে আইনগত সত্তার ফারাক করা কঠিন। কারণ নৈতিক দায়িত্ব এবং আইনের প্রয়োগ প্রায় একই এবং এদের মধ্যে পার্থক্য করা শক্ত।

মুসলিম আইনের উৎস চারটি—(১) কোরন আল্লাহর আদেশ, (২) হাদিস-নবীর পরম্পরা অনুশাসন এবং তাঁর উপদেশাবলী, (৩) ইজমা এবং (৪) কিয়াস্ যদি কোনও বিষয় কোরান বা হাদিসে উহা থাকে তাহলে নিরপেক্ষ অনুশাসনের সাহায্য নেওয়া যাবে যা কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে।

উক্ত আলোচনা সাপেক্ষে তিন তালাক অবধারিত ভাবেই কোরান অনুমোদিত নয় এবং শরিয়ত বিরোধী।

আদালতে বিতর্ক এবং সিদ্ধান্ত

তিন তালাকের আইনি মান্যতা আছে কি? ''সামিম আরা'' মামলায় সর্ব্বোচ্চ আদালত বলেছে যে তিন তালাকের কোনও আইনি মান্যতা নেই। তাই সংবিধানের ১৪১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সামিম আরা মামলাই আইন এবং ভারতে প্রযোজ্য।

মুসলিম ব্যক্তিগত (শরিয়ত) প্রয়োগ আইন ১৯৩৭ সালে প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে ভারতে বসবাসকারী মুসলিম জনগণ তাদের ধর্মীয় অনুশাসন এবং প্রথার প্রয়োগের বিষম প্রভেদ, নিপীড়ন বা অপপ্রয়োগ না করে। ১৯৩৭ সালের আইনের ২ নং ধারায় যে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তার মধ্যে 'বিবাহ বিচ্ছেদ' এবং তালাক শরিয়ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তার বেশি কিছু নয়। তিন তালাক নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন নয় বরং ডিসোলিউশন অব্ মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৩৯ এ তালাক দেওয়ার শর্ত বা কারণগুলি বর্ণিত আছে। যেমন হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ তে বিধিবদ্ধ আছে। ১৯৩৭ সালের আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল ২নং ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলিতে শরিয়তের সঠিক প্রয়োগের উদ্দেশ্যে। যেহেতু শরিয়ত তালাক-এর শর্ত ও পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। ১৯৩৭ সালের আইন তিন তালাকের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত হয়নি। তাই সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিচার্য্য।

পবিত্র কোরানে বিবাহের পরিত্রতা এবং স্থায়িত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে চরম প্রতিকূল অবস্থায় তালাক স্বীকৃত। তালাকের আগে এবং প্রতি পর্যায়ে মীমাংসার ব্যবস্থা আছে এবং মীমাংসা সফল হলে তালাক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর সময় সীমার আগে বাতিল করা 'কোরান' অনুসারে অবশ্য জরুরি। কিন্তু তিন তালাকের ক্ষেত্রে মীমাংসা সম্পূর্ণ রুপে রুদ্ধ। তাই কোরান বিরোধী এবং শরিয়ত আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে। সুতরাং তিন তালাক কখনওই ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারী নয়। এই প্রথা ব্যক্তিগত আইন সিদ্ধও নয়। তাই সর্ব্বোচ্চ আদালত বলেছে, 'what is bad in theology was good in law

'what is bad in theology was good in law but after shariat has been declared as the personal law, Quranically wrong can not be legally right.'

but after shariat has been declared as the personal law, Quranically wrong can not be legally right.'

স্ত্রীকে স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি রূপে বিবেচনা করে ইচ্ছে মতন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে আইনিভাবে সিদ্ধ হলেও ধর্মানুসারে কোরান কখনওই মান্যতা দেয়নি। পবিত্র 'কোরান' অনুসারে তালাক দিলে অবশ্য কোনও কারণ থাকতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়পক্ষ থেকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করতে হবে। বিবাদ মিটে গেলে তালাক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে বাতিল করতে হবে। অথবা মীমাংসা ব্যর্থ হলে তালাক প্রয়োগ করা যাবে। ১৯৩৭ সালের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল যেন কোনও প্রকারের মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের বিরোধী কোনও অনুশাসনের মান্যতা না দেওয়া হয়।

১৯৩৭ সালের আইন সংবিধানের পূর্বে প্রণয়ন করা হয়েছে। সেজন্য সংবিধানের ১৩ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিচার্য। ধর্মাচরনের যে মৌলিক বিষয়গুলি জরুরি সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সেগুলিই সংরক্ষিত হবে। ধর্মে যেগুলি অনুমোদিত কিন্তু নিষিদ্ধ নয় সেই বিষয়গুলি ধর্মীয় আচার নয়। যে কোনও ধর্মীয় অনুশাসন শুধুমাত্র অনুমোদিত বলেই ধর্ম নয়। এই নীতি অনুসারে হানাফি ধারায় তিন তালাক অনুমোদিত হলেও ত্রুটিপূর্ণ এবং অশুভ বলেই স্বীকৃতি দিয়েছে। সুতরাং এই প্রথা কোনও ধর্মের অংশ হতে পারে না। তাই সংবিধানের ২৫ (১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংরক্ষিত নয়।

তালাক সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ বিবৃত মৌলিক অধিকার বিরোধী। অতএব ১৯৩৭ সালের আইনে স্বীকৃত তিন তালাক ১৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাতিল যোগ্য। তিন তালাক বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

সর্বশেষে একথা বলা জরুরি যে তিন তালাক বাতিল ঘোষণা করলেই মুসলিম মহিলাদের ভাগ্য ফিরবে না বরং সঠিক আইন প্রণয়নের জন্য সক্রিয় আন্দোলন প্রয়োজন।

সূত্রঃ

(১) (2017) 9 Sec 1
(২) Outlines of Muhamadan law - Asaf. A4 Fyzee
(৩) Mulla's Principles of Muhamedan law Ed. M. Hidayatullah
(৪) উত্তর সম্পাদকীয়ঃ সুমিত মিত্র।
আবাপ ২৩.৩.২০১৭

পত্রিকার যোগাযোগ

আর এ ৪৪৯ সল্টলেক চিংড়িহাটা
ভি আই পি সুইটসের পেছনে
ফোন : ৯৪৩২২০৯৭৭০

নারী চেতনা ঃ কিছু আলোচনা

নারী স্বাধীনতার ভাবনা প্রকৃত ও বাস্তবিকভাবে কি আমাদের চিন্তার মধ্যে আছে? প্রশ্ন তুললেন **স্বপন মুখোপাধ্যায়**

'হোয়াট'স অ্যাপ' মেসেজে একটা গল্প পড়লাম। একজন মহিলার লেখা, শেয়ার করেছেন যিনি তিনিও একজন মহিলা। দু'জনেই যথেষ্ট আত্মসচেতন এবং এই সময়ের প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের কাছাকাছি মানুষ।

যথেষ্ট টানাপোড়েনে জর্জরিত প্রধান নারী চরিত্র ও অন্য এক পুরুষ চরিত্র গল্পের এক সিদ্ধান্তমূলক বাঁকে এসে একটা সিদ্ধান্ত নেয় ও কিছু অনুতপ্ত ভাবনা প্রকাশ করে (লেখকের চেতনা অনুসরণ ও নিজের চেতনার সংমিশ্রণে)। এই সিদ্ধান্ত ও প্রকাশিত ভাবনার মধ্যে ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের কিছু আভাস পাওয়া যায়। এই মূল্যবোধ, পাপ-পুন্যবোধ জীবনমুখী নয় বরং পশ্চাৎপদ ও কিছুটা মৌলবাদী দর্শনের হালহদিশ ও ইতিহাস এখানে ফুটে ওঠে। এটা পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী নিষ্ঠুর শৃঙ্খলাবোধ ও চাপিয়ে দেওয়া মূল্যবোধেরও কাছাকাছি। এখানে এই সময়ের ব্যক্তিগত ও সমাজ-মানসিকতার একটা বড় সংকট ও ত্রিশঙ্কু অবস্থার আভাসও পাওয়া যায়।

এই ব্যক্তিমন ও সমাজ-মানসিকতার বাস্তবতা তুলে ধরার কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছে এখানে।

সংক্ষেপে গল্পটা এরকম—

প্রধান নারীচরিত্র মোটামুটি শিক্ষিতা, আত্মসচেতন। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বিয়েও হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারে। বিয়ের বেশ কয়েক বছর পার হওয়ার পরেও তাদের কোনও সন্তান হচ্ছে না। এই নিয়ে মেয়েটাকে নিত্য গঞ্জনা সহ্য করতে হয়—স্বামী, শাশুড়ি সকলের। অথচ মেয়েটা নিজের শরীরের তেমন কোনও অসুবিধা বুঝতে পারে না। তাহলে? ক্রমশ মরিয়া হয়ে ওঠে মেয়েটা দিবারাত্র গঞ্জনা আর অত্যাচারে।

এমতাবস্থায় একদিন দুপুরে শ্বশুরবাড়ির সকলের অনুপস্থিতিতে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে ঘর তোলপাড় করে খুঁজে পায় তাদের ডাক্তারি চেকআপের মেডিক্যাল রিপোর্ট। স্বামীর সযত্নে লুকিয়ে রাখা রিপোর্ট, যেখানে স্পষ্ট লেখা আছে—'অসুবিধাটা মেয়েটার নয়, স্বামীর শরীরেই আছে। তার স্পার্ম-কাউন্ট কম'। অথচ যাবতীয় অত্যাচার সইতে হচ্ছে মেয়েটাকে!

রিপোর্ট দেখে আরও মরিয়া হয়ে ওঠে মেয়েটা। ফোন করে সেই অচেনা নম্বরের ছেলেটাকে। বেশ কিছুদিন মাঝেমাঝেই এই নম্বর থেকে ফোন পাচ্ছিল সে। অশ্লীল কিছু নয়, তাই ব্লক করেনি। বরং অতীত প্রসঙ্গ টেনে ছেলেটা মনে করাচ্ছিল, মেয়েটার ফেলে আসা দক্ষতা ও স্বপ্নের কথা, উৎসাহ দিচ্ছিল। নিজের স্বত্তাকে যেন কিছুটা হলেও খুঁজে পাচ্ছিল মেয়েটা, ছেলেটার কথায়।

রিপোর্ট দেখে আরও মরিয়া হয়ে ওঠে মেয়েটা। ফোন করে সেই অচেনা নম্বরের ছেলেটাকে। বেশ কিছুদিন মাঝেমাঝেই এই নম্বর থেকে ফোন পাচ্ছিল সে। অশ্লীল কিছু নয়, তাই ব্লক করেনি।

একদিন ছেলেটা এল। মেয়েটা জানতে পারে এ সেই নাচের স্কুলের হেড দিদিমণির

ছেলে! যেখানে বিয়ের আগে নাচ শিখত মেয়েটা। এই ছেলেটা বিয়ের আগে একসময় প্রেম নিবেদনও করেছিল। সেই নিবেদনে 'প্যাশন' ছিল, সম্মানবোধও ছিল। মেয়েটা প্রত্যাখ্যান করেছিল। কম বয়সের 'ইনফ্যাচুয়েশন', 'এক তরফা ইমোশন' ইত্যাদি কথা বুঝিয়ে।

আজ মরিয়া হয়ে সেই ছেলেটার কাছেই নিজেকে উন্মুক্ত করতে চায় মেয়েটা সন্তান ধারণের আকাঙ্ক্ষায়। হতে পারে সাময়িক সম্পর্কের তাগিদ, নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমিক ছেলেটা তার যাবতীয় প্রেমভাবনা, ইমোশন, প্যাশন নিয়ে ছিটকে সরে যায় এবং প্রভূত অবজ্ঞা প্রকাশ করে মেয়েটার প্রতি। মেয়েটাও তৎক্ষণাৎ ভীষণ অনুতাপ প্রকাশ করতে থাকে নিজের আচরণের জন্য। তার মনে হয় খুবই ছোট হয়ে গেল সে ছেলেটার কাছে। কিন্তু কি এমন হল? মনের কোন রসায়ন থেকে তারা এমন আচরণ করল?

সাহিত্য ও চারপাশের ভারতীয় সমাজে এই আচরণ ও আবহমান 'মনুবাদী' পাপ-পুন্য-শারীরিক পবিত্রতা তথা 'সতীত্ব'বোধ সঞ্জাত মূল্যবোধ বেশ সুলভ। ইদানিং আবার এর স্বপক্ষে তুমুল প্রচার ও গা-জোয়ারী শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়!

এরপর ছেলেটা তার মায়ের নাচের স্কুলের পরিচালনভার নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয় মেয়েটাকে। সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে মেয়েটা এবং এর মধ্যে স্বনির্ভর আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখতে পায় সে। মেয়েটা তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জ্বলন্ত সমস্যাটিকে একপ্রকার পাশ কাটিয়ে, অমীমাংসিত রেখে তথা ধামাচাপা দিয়েই এগিয়ে যেতে চায় আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে। এমন একটা সমস্যা যা প্রত্যেক মানুষকেই সমাধান করতে হয় কোনও না-কোনওভাবে। এই মানবিক বাস্তবতাকে গৌণ করে দিয়ে, অবদমিত করে এগোতে চাওয়ার পরিণতি ভাল হয় না। ইতিহাসে তথা সমাজেতিহাসে এর অসংখ্য প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে।

আবার এর পাল্টা এক ধরনের মূল্যবোধ ও জীবনযাপনের ছাপও দেখা যায়। বিশেষত, আধুনিক শিল্প-সাহিত্য- সিনেমার একটা পরিসরে এবং এক শ্রেণির মানুষের জীবনযাপনে। এখানেও মানবিক সম্মানবোধ, প্রেম-ভালোবাসা-জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকারের পথে গড়ে ওঠে নারী-পুরুষের উদ্দাম শারীরিক সম্পর্ক। এই দুইয়ের মধ্যে নেই 'নারী অর্ধেক আকাশ' বিষয়টা।

তাহলে কি কোথাও নেই 'নারী অর্ধেক আকাশ'-এর বাস্তব অস্তিত্ব! এ কি শুধুই এক স্বপ্ন ও আদর্শের বিলাসভাবনা? না, আমার তা মনে হয় না। হয়তো আছে, হতেই পারে সেখানেও আছে অসংখ্য উত্থান-পতন, এগোনো- পিছোনো, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, দ্বন্দ্ব। কিন্তু সেখানে প্রাথমিকভাবে এবং প্রয়োগের দিক থেকে এই মূল্যবোধ ও জীবনচর্চাকে গ্রহণ করা হয়েছে, 'নারী মানুষ' এবং 'নারীকে অর্ধেক আকাশ হতে হবে' ও সেভাবেই ভাবতে হবে গোটা সমাজকে। 'দ্বন্দ্ব'ত আছেই, থাকবে অবশ্যই। কিন্তু কোন 'দ্বন্দ্বের' সমাজে 'উত্তরণের' বিষয়টা যথেষ্ট পরিণত সেটা

সাহিত্য ও চারপাশের ভারতীয় সমাজে এই আচরণ ও আবহমান 'মনুবাদী' পাপ-পুন্য-শারীরিক পবিত্রতা তথা 'সতীত্ব'বোধ সঞ্জাত মূল্যবোধ বেশ সুলভ। ইদানিং আবার এর স্বপক্ষে তুমুল প্রচার ও গা-জোয়ারী শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়!

বিচার করেই কি আমাদের গ্রহণ-বর্জন গড়ে উঠবে না?

'দ্বন্দ্ব' সব সমাজ ও ব্যবস্থার অন্দরেই কাজ করে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে সবসময় তা নাও বুঝতে পারি! তাই ত 'পুরনো সমাজের গর্ভ থেকেই নতুন সমাজ ব্যবস্থা জন্মলাভ করে' তাকে স্বীকার ও অস্বীকার করে। 'দ্বন্দ্বের' পূর্ণতার লগ্নেই নতুন সমাজের আগমন, বদল ঘটে। তাই তো প্রথম ধরনের মূল্যবোধ 'সতীদাহ', 'বৈধব্যের' কঠিন নিগড় আলগা করে এগোনোর পথ খোঁজে। পরের মূল্যবোধ ও জীবনচর্যার পণ্যতান্ত্রিকতা আদিম ব্যবস্থার দিকে কিছুটা গিয়েই পথ হাতড়ানির তাগিদ অনুভব করে। উত্তরণের তাগিদ পূর্ণভাবে বিরাজ করছে তৃতীয় মূল্যবোধের সমাজব্যবস্থার মধ্যেও।

ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এই সময়ে 'আধা-সামন্ত্রতান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক'। এখানে এখন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অবক্ষয়ের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেও নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে চাইছে ও পারছে উপনিবেশবাদের স্বার্থের তাগিদে

ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এই সময়ে 'আধা-সামন্ত্রতান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক'। এখানে এখন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অবক্ষয়ের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেও নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে চাইছে ও পারছে উপনিবেশবাদের স্বার্থের তাগিদে। এবং পুঁজিতন্ত্র যথেষ্ট অবিকশিত সেই উপনিবেশের স্বার্থের কারণেই। এই দুটি সমস্যায় বিদ্ধ হচ্ছে সব মানুষের জীবন এবং নারীজীবন ও অর্ধেক আকাশের স্বপ্ন ও বাস্তবতা দুটোই। কারণ, পুরুষতন্ত্রের পাশাপাশি এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার শাসন-পোষণও নারীজীবনের বাস্তবতা।

গল্পের বা শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্রের এবং দৈনন্দিন বাস্তবজীবনের যে কোনও সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তজনিত প্রশ্নে 'ধার্মিক' বিচারের পরিবর্তে জীবনকে তার বাস্তবতার নিরিখেই বিচার করা উচিত, এমন আশা করাই যায়।

আমরা বলি, 'নারী অর্ধেক আকাশ'। আমরা মানে, যারা সবসময় প্রগতিশীল আন্দোলনের কাছাকাছি থাকতে চাই। সবসময় পারি কিনা তা ভিন্ন আলোচনা। কিন্তু আমরা কি নারীকে আপন পৃথিবী তথা নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন এবং সেই জীবনের যাবতীয় সিদ্ধান্ত, সমাধান ও ব্যাপ্তিকে তার নিজের জীবনের বাস্তবতার শর্তে সমাধান করতে দিতে প্রকৃতই তথা বাস্তবিক প্রস্তুত আছি? আমরা কি নারীকে 'আপন ভাগ্য জয় করার' অধিকার দিতে প্রকৃতই প্রস্তুত? নাকি নারীর অর্ধেক আকাশেও আমাদের দখলদারি তথা আমাদের সব শর্ত চাপিয়ে রেখে আমাদের প্রভুত্বের শর্তে 'অর্ধেক আকাশ' হওয়ার অধিকারটুকুর কথাই ভাবছি? কোনটা? প্রকৃত ও বাস্তবিক।

মানুষী কথা পত্রিকার গ্রাহক হন

মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস ও অর্থনীতি

মুর্শিদাবাদের অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের ভূমিকা আলোচনা করলেন **প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়**

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময়ই মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবাংলার একটি পৃথক জেলা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইতিহাসের পাতা উল্টোলে দেখা যায় সেটাই এই জেলার স্বাতন্ত্র্যতার একমাত্র পরিচায়ক নয়। এ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। বস্তুত সুদূর অতীতকাল থেকেই বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের টানাপোড়েনের সাথে মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে। প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে ঔপনিবেশিক পর্ব হয়ে স্বাধীনতা-উত্তর মুর্শিদাবাদের অর্থনৈতিক জীবনও তাই স্বাভাবিকভাবেই বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক বিন্যাসের তারতম্যের সঙ্গেই। স্বাধীনতা উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনীতির রূপরেখা অঙ্কনেও এই প্রেক্ষাপটকে অস্বীকার করা কঠিন।

প্রাচীনকাল থেকেই মুর্শিদাবাদ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল বাংলার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। একথা বলা খুব একটা ভুল হবে না যে, বাংলা যখন ইতিহাসের পাতায় উঠে আসল তখন থেকেই বাংলার একটি অন্যতম প্রসিদ্ধ অঞ্চল হিসেবে উক্ত অঞ্চল আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। গৌড়ের শাসক শশাঙ্কের রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণতেই গড়ে উঠেছিল তার রাজধানী। প্রত্নতাত্বিক খননকার্যের ফলে জানা যায় শশাঙ্কের সমসাময়িক কালে এই অঞ্চল রাজনৈতিক ও অথনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ছিল। পরবর্তীকালে পাল-সেন শাসনে এই অঞ্চল অর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরও সমৃদ্ধি লাভ করে। বখতিয়ার খলজী কর্তৃক গৌড় বিজয়ের পর এই অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীনে চলে যায়। ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী রাজবংশের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ হয়েছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য বলে যে, এই অঞ্চল শূররাজাদের বিশেষ কীর্তিরও সাক্ষী। এই শূররাজারা সিংহেশ্বরী নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এটি বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত। আইন-ই আকবরীতে আবুল ফজল এগারো জন শূররাজার নাম উল্লেখ করেছেন, যারা এই অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।[২]

বর্তমান মুর্শিদাবাদের নামকরণ নিয়ে অবশ্য পন্ডিতমহলে নানারকম মত লক্ষ্য করা যায়। কথিত আছে যে, মুর্শিদাবাদ শহরের নাম থেকেই এই নামকরণ হয়েছে। এই শহরের প্রতিষ্ঠাকাল বহু পুরনো। মুকসুদন দাস নামে জনৈক সন্ন্যাসী এখানে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় বাংলার শাসক ছিলেন হুসেনশাহ। সন্ন্যাসীর নামে ঐ নগরের নাম রাখা হয় মুকসুদাবাদ।[৩] অন্য আরেকটি মতে মুখসুদ খাঁ নামে জনৈক বণিক এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ভাগীরথী নদীর তীরে একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। তাঁর নাম থেকেই ঐ স্থানের নাম হয় মুখসুদাবাদ।[৪] প্রাচীন নথিপত্র ঘাঁটলে অবশ্য

প্রাচীনকাল থেকেই মুর্শিদাবাদ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল বাংলার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। একথা বলা খুব একটা ভুল হবে না যে, বাংলা যখন ইতিহাসের পাতায় উঠে আসল তখন থেকেই বাংলার একটি অন্যতম প্রসিদ্ধ অঞ্চল হিসেবে উক্ত অঞ্চল আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে।

দেখা যায় যে, ভবিষ্য পুরাণের ব্রহ্মান্ড খন্ডে মোরাসুদাবাদের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীকালে এই মুখসুদাবাদ বা মোরাসুদাবাদ মুর্শিদাবাদে পরিণত হয়।[৫] সুতরাং মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীনত্ব সংশয়াতীত।

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল আমলের আর্থ-রাজনীতিতে চাপ সৃষ্টি করে। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘদিন থাকার ফলে দিল্লি তথা উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর মুঘল শাসকদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে আসে। কেন্দ্রীয় দুর্বলতার সুযোগে আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালানোর প্রয়াস দেখা দেয়। এইরকম আর্থ রাজনৈতিক সংকটজনক পরিস্থিতেতে একমাত্র সুবা বাংলা থেকেই নিয়মিতভাবে কেন্দ্রীয় কোষাগারে রাজস্ব জমা পড়ত। বাংলায় আজিম-উস-শান সুবাদার পদে নিযুক্ত হলে এখানেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তিনি সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে আগ্রহী ছিলেন না। তাই ঔরঙ্গজেব বাংলার দেওয়ান হিসেবে এমন একজনকে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন যিনি কেন্দ্রীয় কোষাগারে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করবেন এবং একইসাথে রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবেন। সম্রাটের দৃষ্টিতে এরকমই একজন ব্যাক্তিত্ব ছিলেন হায়াদ্রাবাদের দেওয়ান মহম্মদ হাদি। ঔরঙ্গজেব ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করে 'করতলব খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। কর্মদক্ষতার জোরে অচিরেই করতলব খাঁ বাংলার নিজাম পদও লাভ করেন। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'মুর্শিদকুলি খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হন। শাসনকার্যের সুবিধা ও নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুখসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন এবং নিজের নাম অনুযায়ী মুখসুদাবাদের নাম পাল্টে রাখেন 'মুর্শিদাবাদ'।[৬] বলাবাহুল্য, মুর্শিদাবাদের নামকরণের সঠিক কাল নির্ণয় করা কঠিন। তবে 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' এবং 'তারিখ-ই বাংলায়', মুর্শিদাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে ১৭০৪ সালের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] তাছাড়া মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল থেকে যে মুদ্রা তৈরি হয়েছিল তাতেও ১৭০৪ সালের উল্লেখ ছিল। এই কারণেই ঐতিহাসিকদের ধারনা ১৭০৪ সালেই মুর্শিদাবাদ শহরের নামকরণ করা হয়েছিল।[৮]

সুবা বাংলার রাজধানী রূপে মুর্শিদাবাদের উত্তরণ শুধু এখানকার রাজনৈতিক জগতকেই নয় এখানকার অর্থনৈতিক জীবনকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বলা চলে, মুর্শিদাবাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এই সময় থেকেই উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। মুর্শিদাবাদের মধ্য দিয়ে নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য সুবিধাজনক হওয়ায় বিদেশী বণিকরাও সেখানে ভিড় করতে থাকে। সমসাময়িক বিদেশী পর্যটক ও ফরাসী ঐতিহাসিকদের বিবরণেও মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার প্রাচুর্য ধরা পড়েছে। কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির প্রধান জন ল'র বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দেশ বিদেশ থেকে বহু মানুষ সেই সময় বাংলার সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে এখানে পাড়ি দিত।[৯] এ প্রসঙ্গে ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ের মন্তব্যতেও উল্লেখ পাই।[১০] যাই হোক, নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদের এই আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধিতে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল অন্যতম। নদীবেষ্টিত হওয়ায় এখানে জলপথের বিস্তার ঘটেছিল। কর্ণসুবর্ণ বিখ্যাত নদী বন্দর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ভাগীরথী-পদ্মার নাব্যতা এই অঞ্চলে জলপথের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। কারণ এর ফলে পূর্ববঙ্গের সাথে দূরত্বও কমে গিয়েছিল। অরঙ্গাবাদ, জাহাঙ্গীরপুর, জিয়াগঞ্জ, বালুচর, খড়গ্রাম, মুনিয়াডিহি, ভগবানগোলা, গাঙ্গুরী প্রভৃতি অঞ্চল সমূহ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[১১] বহু বণিক মুর্শিদাবাদকেই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল। এর ফলেই জগৎ শেঠের মতো ব্যাঙ্কিং পরিবারগুলি গড়ে উঠেছিল। সেই সময় জগৎ শেঠের আর্থিক লেনদেনের ব্যপকতা লক্ষ্য করে এডমন্ড বার্ক একে 'Bank of England' এর সাথে তুলনা করেছিলেন।[১২]

নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদের অর্থনীতির বিকাশ এই জেলার সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষির তুলনায় শিল্প ও

সেবাকর্মের আপেক্ষিক গুরুত্বকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। পরবর্তীকালে এই জেলার অর্থনৈতিক জীবনেও যার প্রভাব ছিল অপরিসীম। রাজধানী শহর হওয়ায় এখানে অস্ত্র-শস্ত্র, নৌকা যানবাহন, সাজসরঞ্জাম এবং অভিজাতদের বিলাস দ্রব্যের প্রয়োজনে শিল্পায়নের প্রসার ঘটে। এর প্রভাব জেলাঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিতেও পরিলক্ষিত হয়। রেশমী বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল ও বিপুল লোকের খাদ্যশস্যের প্রয়োজনে এই পর্বে বাণিজ্যিক কৃষি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে আবার পূর্বের শিল্পধারাও তাল মিলিয়ে চলতে থাকে।[১৩] সব মিলিয়ে এক সমৃদ্ধ অর্থনীতি ছিল এই পর্বের মুর্শিদাবাদের আর্থিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অর্থনৈতিক রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ায় আরও একটি উপাদান সক্রিয় ভূমিকা নেয় তা হল ব্রিটিশ বাণিজ্যের অপ্রতিরোধ্য প্রসার।[১৪] সমকালীন সামাজিক কাঠামোয় যার অভিঘাত ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই সামগ্রিক রূপান্তরের ফলে একদিকে বিকাশমান নগরকেন্দ্র ছাড়াও সূতী, জঙ্গীপুর, কান্দি, ভগবানগোলা ইত্যাদি স্থানে নতুন শহরের উদ্ভব ঘটতে থাকে। অন্যদিকে, বংশানুক্রমিক পেশা ছেড়ে অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক পেশার দিকে মানুষ ঝুঁকতে থাকে। এই পর্বেই রেশম শিল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজকর্মে একই জাতির নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হতে শুরু করে।[১৫] তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে একদিকে নবাবী রাজধানী শহরের জাঁকজমক এবং অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের ফলে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিকাশ ঘটিয়েছিল বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও জেলাঞ্চলের অর্থব্যবস্থার ভবিষ্যৎ অবনতির বীজও সুনিশ্চিত ভাবেই বোনা হয়ে গিয়েছিল এই কালপর্বেই। দুটি উপাদানের ভূমিকা ছিল এক্ষেত্রে সক্রিয়, প্রথমত, ব্রিটিশ বাণিজ্যের চারিত্রিক পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়ত, ১৭৪০ এর দশকে উপর্য্যুপরি 'বর্গীর হাঙ্গামা'।[১৬] যে আঘাত কাটিয়ে ওঠা এই জেলার অর্থনীতির পক্ষে আর কখনওই সম্ভব হয়নি।

পলাশী-উত্তর পর্বে স্বাধীন নবাবীর পতনের সাথে সাথে মুর্শিদাবাদের আর্থিক সচ্ছলতার সূর্য চূড়ান্তভাবেই অস্তমিত হয়। ১৭৬৫ তে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভ মুর্শিদাবাদকে মর্যাদাহীন করে তুলেছিল। কারণ এর ফলে মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলকাতা হয়ে ওঠে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার মূল কেন্দ্র। কলকাতায় কোম্পানীর কাউন্সিল দেওয়ানী বিষয়ক সকল ক্ষমতার ভার বহন করে। দেওয়ানী লাভের পর রাজনীতি ও অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেই কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ শুরু হয় এবং চরম প্রকাশ ঘটে ১৭৭৩-এর 'রেগুলেটিং অ্যাক্টের' মধ্য দিয়ে। এই আইনানুযায়ী একজন গভর্ণর জেনারেলের পদ সৃষ্টি করা হয়, যার হাতে তৎকালীন বাংলা প্রেসিডেন্সির শাসনকার্যের ভার দেওয়া হয়। গভর্ণর জেনারেলকে সাহায্য করার জন্য একটি কাউন্সিলও গঠিত হয়। কলকাতাতে বিচার বিভাগ স্থাপিত হয়। ক্রমান্বয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে সমস্ত দপ্তর কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ফলে মুর্শিদাবাদ সুবা বাংলার রাজধানীর মর্যাদা হরিয়ে একটি জেলা শহরে পরিণত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের এই পালায় তিনটি ঘটনা মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং পুরনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মারাত্মক আঘাতে বিপর্যস্ত করে দেয়। এগুলি হল — প্রথমত, 'পলাশীর লুণ্ঠন', দ্বিতীয়ত, দেওয়ানী লাভের পরবর্তীকালে বাংলার রাজস্বের ব্যাপকমাত্রায় বিদেশে পাচার এবং তৃতীয়ত, বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'।[১৭] সামগ্রিকভাবে, যা মুর্শিদাবাদের কৃষি ও শিল্পকে বিপর্যস্ত করে দেয়। এক সময়ের সুবা বাংলার সমৃদ্ধ রাজধানী ক্রমে পরিণত হয় ভারতের অন্যতম দরিদ্র জেলায় এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বেও যার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে অর্থাৎ উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বেও মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনীতির আমূল কোনও রূপান্তর ঘটেনি। স্বাধীনতার পরবর্তী দশকগুলিতেও এই জেলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি হল কৃষিকাজ। বিগত কয়েকটি জনগণনাতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট বোঝা যায়।[১৮] সারণি ১এ বিষয়টি তুলে ধরা হল—

মুর্শিদাবাদ জেলার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রভিত্তিক প্রবণতা

(সারণি - ১)

মুর্শিদাবাদ জেলার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রভিত্তিক প্রবণতা

ক্ষেত্র	১৯৭১	১৮৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
ক) কৃষিক্ষেত্র					
১) কৃষক	৩,০০,৫৯১(৩৭.৩৪)	৩,৫৪,২৯২(৩৫.৩৭)	৪,৪৮,২৬৯(৩১.৫৭)	৩,৬৯,৮৮৫(১৮.৪৮)	৩,৮১,০৭৬(১৪.৭২)
২) কৃষিশ্রমিক	২,৭৫,১০২(৩৪.১৭)	৩,৩৫,৬৪০(৩৩.৫)	৪,০৭,১৮০(২৯.৪২)	৫,৬০,৩৭৫(২৭.৯৯)	৮,৪২,২৯৪(৩২.৫২)
৩) পশুপালন ইত্যাদি	১৬,১০২	—	২৭,৩০৩	—	—
খ) শিল্পক্ষেত্র					
১) খনন, মুক্তখনন	১.৫০	—	৬.৩৫	—	—
২) কুটিরশিল্প	৫২,১৩৫(৬.৪৮)	৫৭,৬৯৩(৫.৭৬)	১,৯৪,৩১৮(১৩.৬৯)	৪,০৮,৮৫৯(২০.৪২)	৪,৬৬,০০৭(১৭.৯৯)
৩) অন্যান্য শিল্প	১৬,৯৮৭	—	৬১,৮৮৫	—	—
৪) নির্মাণ শিল্প	১৩,৬৮১	—	৫০,৩৪০	—	—
গ) সেবাক্ষেত্র					
১) ব্যবসা-বাণিজ্য	৩২,৭২৩	—	১,০৯,৯৭৮	—	—
২) পরিবহন ও যোগাযোগ	১০,৮৭০	—	৭৯,৭৫৯	—	—
৩) অন্যান্য সেবা	৪৩,৩৩৬	—	৩০,২১৯	—	—
অন্যান্য কর্ম ক(৩) +	১,৩৩,৮৭৬(১৬.৬৩)	২,৫৪,০৯৮(২৫.৩৭)	৩,৬০,১১৯(২৫.৩৬)	৬,৬২,৬৪৪(৩৩.১০)	৯,০০,৫৩০(৩৪.৭৭)

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০১১ এবং জেলা গণনা দপ্তর প্রদত্ত খসড়া জনগণনা তথ্য।

উপরের সারণি -১ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে জেলার বেশিরভাগ মানুষই কৃষিকর্মের সাথে যুক্ত। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল বিগত দু'দশক ধরে সাধারণ কৃষকের সংখ্যার ক্রমাবনতি ও তার সাথে পাল্লা দিয়ে কৃষিশ্রমিকের ক্রমবর্ধমানতা। এখন প্রশ্ন হল বিগত দু'দশকে কৃষিজমি থেকে বিচ্যুত এই বিপুল কর্মীবাহিনীর গন্তব্যস্থল কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের জেলার শিল্পক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম থেকেই সেভাবে ভারি শিল্প গড়ে ওঠে নি। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদের আর্থিক সমৃদ্ধিকে মেনে নিয়েও বলা যায়, সেই সময়ে বিকশিত শিল্পগুলি ছিল মূলত ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প, যা সমকালীন অভিজাত ও দরবারি চাহিদা পূরণ ও নাগরিক অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই নগরকেন্দ্র রূপে মুর্শিদাবাদের গুরত্ব হ্রাস পাবার সাথে সাথে সেগুলিতেও ভাটার টান লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে মুর্শিদাবাদে বড় শিল্প বলতে রয়েছে — বিংশ শতকের ৮০ দশকে গড়ে ওঠা ফরাক্কায় এনটিপিসি ২১০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ২০০৭-এ সাগরদিঘিতে গড়ে ওঠা ৬০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সাগরদিঘি থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট।[১৯] এছাড়া বিড়লা গ্রুপ গড়ে তুলেছে ১.৫ মিলিয়ন টন বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, ঐ সাগরদিঘিতেই নাম—'সোনার বাংলা'। যেখানে বিড়লা গোল্ড নামে সিমেন্ট উৎপাদিত হচ্ছে। ফরাক্কার কাছেই গড়ে উঠেছে আরেকটি বড় সিমেন্ট কারখানা 'অম্বুজা'।[২০] ২০১০ সালে লালবাগের কাছে আয়েশবাগে গড়ে উঠেছে একটি জুট

মিল। মালিক ডাব্বু আগরওয়ালের 'সারদা জুট মিল' এ প্রতিদিন গড়ে ১০০ কুইন্টাল পাটের কাজ হয়। শ্রমিক সংখ্যা ১৫০০। উৎপাদিত হয় পাটের সুতলি দড়ি এবং নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত বিশালাকার চটের চাদর।[২১] সুতরাং, একথা বলা ভুল হবে না যে, স্বাধীনতার পর ছ'দশকের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও মুর্শিদাবাদ জেলা ভারি শিল্পবিহীন জেলা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সরকার এলেও মুর্শিদাবাদের শিল্প মানচিত্রে বিশেষ কিছুই পাল্টায়নি, বরং উল্টে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে মণীন্দ্রমিল, বিটিমিল, বেলডাঙ্গা সুগার মিলের মতো আধুনিক মিল।[২২] অথচ জনসংখ্যার দিকে চোখ ফেরালে একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে মুর্শিদাবাদ জেলা হল বাংলার অন্যতম জনবহুল অঞ্চল।[২৩] ভারি শিল্পবিহীন এই বিপুল জনসংখ্যার জীবন-জীবিকার একমাত্র আশ্রয়স্থল তাই আজ বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্র।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান অসংগঠিত শিল্প হল ওরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ান অঞ্চলের বিড়ি শিল্প। আন্তর্জাতিক বাজারেও যার বিরাট চাহিদা রয়েছে। এই শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ। ২০০টিরও বেশি বড় বড় বিড়ি কারখানা রয়েছে।[২৪] জেলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প হল রেশম-খাদি শিল্প। যেগুলি দৌলতাবাদের পাশে চক-ইসলামপুর এবং রঘুনাথগঞ্জের কাছে গণকর-মির্জাপুরে কেন্দ্রীভূত। এছাড়াও কান্দি-খড়গ্রাম সহ জেলার বিভিন্ন স্থানে এই শিল্প ছড়িয়ে রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের ২৮০টি রেশমখাদি সংস্থার ৯৬টি রয়েছে মুর্শিদাবাদে। এর সাথে যুক্ত আছেন বারো হাজারেরও বেশি তাঁতি।[২৫] এর পাশপাশি রয়েছে কাঁসার বাসন শিল্প, গজদন্ত শিল্প, শোলা শিল্প, শঙ্খ শিল্প এবং চন্দনকাঠের শিল্প। এগুলি মূলত ঐতিহ্যবাহী অসংগঠিত শিল্প।[২৬] একসময়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এই শিল্পকর্ম ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করলেও বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে এই শিল্পগুলি মৃতপ্রায় অবস্থায় ধুঁকছে এবং এই শিল্পগুলির সাথে যুক্ত মানুষেরা পেটের টানে অন্য পেশাকে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে জেলায় বেশ কিছু ক্ষুদ্র শিল্প ও কারখানা গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রঘুনাথগঞ্জের ওমরপুরের কাছে পতাকা বিড়ি প্রতিষ্ঠিত ফুড প্রসেসিং কারখানা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে তৈরি হয়। এছাড়াও বহরমপুর ও জিয়াগঞ্জে আরও ৫টি কারখানা রয়েছে। সারা মুর্শিদাবাদ জুড়ে রয়েছে প্রায় শতাধিক চালকল, বহরমপুর বেলডাঙ্গাসহ বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চাশটির বেশি তেলকল, প্রায় সমপরিমাণ পাথর ভাঙ্গার কল, মশলা তৈরির কারখানা, মুড়ি, চিড়ে ভাজা, চানাচুর, ময়দা-আটা তৈরির কারখানা। এগুলির বেশিরভাগই বহরমপুর, লালগোলা, জিয়াগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জে অবস্থিত। লালগোলায় 'ঋষভ' সহ কয়েকটি ডিটারজেন্ট তৈরির কারখানাও আছে। বেলডাঙ্গায় বেশ কিছু চুলের কারখানা আছে যেগুলি চিন, জাপান প্রভৃতি দেশে 'প্রসেসড চুল' রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা আয় করে। ফরাক্কা ও সাগরদিঘির তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ফ্লাই অ্যাশ থেকে তৈরি ইটের করাখানা এবং অসংখ্য মাটির ব্রিকফিল্ড রয়েছে। মুর্শিদাবাদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট বড় অনেক

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান অসংগঠিত শিল্প হল ওরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ান অঞ্চলের বিড়ি শিল্প। আন্তর্জাতিক বাজারেও যার বিরাট চাহিদা রয়েছে। এই শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ। ২০০টিরও বেশি বড় বড় বিড়ি কারখানা রয়েছে।

তাঁত কারখানাও, যেখানে ধুতি, শাড়ি, মশারি, গামছা তৈরি হয়। এছাড়া মুর্শিদাবাদে রয়েছে বেশ কয়েকটি মাঝারি আকারের ফ্লাওয়ার মিল ও অসংখ্য শ'মিল।[২৭] সর্বোপরি, এই জেলার আরও দুটি পুরনো শিল্পের কথা না বললেই নয়, যেগুলি হল—মৃৎ শিল্প ও মিষ্টান্ন শিল্প। এই জেলার মৃৎ শিল্পের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। এখানকার মৃৎশিল্পীদের দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায় - একদল মাটির বাসনপত্র, হাঁড়ি, কলসি, কুঁজো ইত্যাদি তৈরি করেন আর অন্যান্যরা প্রতিমাশিল্পী। জেলার প্রায় সর্বত্রই মৃৎশিল্পীদের বসতি আছে। পালপাড়া বা কুমোরপাড়া নামে জেলায় বেশ কিছু গ্রামের অস্তিত্ব আছে। কাঁঠালিয়া, দোহালিয়া, বোলতুলি, বালিরঘাট, পালপাড়া, মালিয়ান্দি প্রভৃতি গ্রামের সহস্রাধিক কুম্ভকার পরিবার দীর্ঘদিন ধরে এই শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন।[২৮] অন্যদিকে এই জেলার মিষ্টান্ন শিল্পের বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। বহরমপুরের ছানাবড়া, ইসলামপুরের স্পঞ্জ রসগোল্লা এবং বেলডাঙ্গার মনোহারার সুনাম জেলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ঠিক কতজন এই শিল্পের সাথে যুক্ত তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও এই সংখ্যাটা কোনওমতেই ৫০০০-এর কম হবে না।[২৯]

সব মিলিয়ে, তাই বলা যায় যে, প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্ব পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনীতি মূলত দাঁড়িয়ে রয়েছে কৃষি ও বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় অসংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রের ওপর। আবার বিগত কয়েক দশক থেকে কৃষিতে কর্মহীনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উত্তরোত্তর চাপ বাড়ছে এই অসংগঠিত ক্ষেত্রের ওপরেই। তাই কৃষিজীবীরা পেশা হারিয়ে পরিযায়ী নির্মাণ কর্মী রূপে দেশে বিদেশে দলে দলে পাড়ি দিচ্ছেন কিংবা রিক্সাচালনা বা ইটভাটার মতো বিনা পুঁজির কায়িকশ্রমে এই জেলার অসংখ্য মানুষ যুক্ত হচ্ছেন, সে দৃষ্টান্ত মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনৈতিক জীবনে খুবই সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অথচ একথা বলা ভুল হবে যে, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো মুর্শিদাবাদ জেলায় শিল্পায়নের সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না, বরং একটু তলিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিল্পায়নের প্রধান দুটি উপকরণ — ১) পর্যাপ্ত মানব সম্পদের যোগান এবং ২) ভূপ্রকৃতি বা কৃষি উন্নয়ন— সম্ভাবনার দুটি উপাদানই মুর্শিদাবাদ জেলায় উপস্থিত ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমল থেকেই কলকাতা কেন্দ্রিক উন্নয়নের চিন্তা ও স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও সেই প্রবণতার ধারাবাহিকতা মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনীতিকে কার্যত স্থবির করেই রেখে দেয়।[৩০] আর এই অনুন্নয়নের সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে একসময়কার সুবা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয় সমগ্র ভারতবর্ষেরই এক অন্যতম প্রধান দারিদ্রপ্রবণ অঞ্চল। ভারি শিল্পবিহীন মুর্শিদাবাদ জেলার বিপুল জনসংখ্যার জীবন ও জীবিকার একমাত্র আশ্রয়স্থল বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্র। মুর্শিদাবাদ অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার পরিধিতে এই কঠিন সত্যকে অস্বীকার করা শুধু কঠিনই নয়, কার্যত অসম্ভব।

এই অনুন্নয়নের সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে একসময়কার সুবা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয় সমগ্র ভারতবর্ষেরই এক অন্যতম প্রধান দারিদ্রপ্রবণ অঞ্চল।

সূত্রনির্দেশ

১. কাজী আমিনুল ইসলাম, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-জঙ্গীপুর, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ২০১১, পৃ. ২২।

২. তদেব, পৃ. ২৩।

৩. বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য, মুর্শিদাবাদ জেলা গেজিটিয়ার, মুর্শিদাবাদ, ২০০৩, পৃ. ৯৭।

৪. তদেব, পৃ. ৯৭।

৫. তদেব, পৃ. ৯৭।

৬. সুশীল চৌধুরী, নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২১।

৭. তদেব, পৃ. ২১।

৮. তদেব, পৃ. ২১।

৯. তদেব, পৃ. ১৫।

১০. তদেব, পৃ. ১৫।

১১. বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য,পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১।

১২. তদেব, পৃ. ৩৩৮।

১৩. সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত, চেনা মুর্শিদাবাদঃ অচেনা ইতিবৃত্ত, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪।

১৪. তদেব, পৃ. ৫৫-৫৬।

১৫. তদেব, পৃ. ৫৯।

১৬. তদেব, পৃ. ৬০।

১৭. তদেব, পৃ. ৬১-৬২।

১৮. বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত , পৃ. ২১৬ এবং DISTRICT CENSUS HANDBOOK, MURSHIDABAD, SERIES-20, WEST BENGAL.।

১৯. অরূপ চন্দ্র,ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা এবং মুর্শিদাবাদে শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলন, বাসভূমি প্রকাশন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ২০১৭, পৃ. ২৯।

২০. তদেব, পৃ. ২৯।

২১. তদেব, পৃ. ২১।

২২. তদেব, পৃ. ২২।

২৩. DISTRICT STATISTICAL HANDBOOK, MURSHIDABAD, 2015, Bureau of Applied Economics and Statistics, Development of Planning Statistics and Programme Monitoring, Government of West Bengal.।

২৪. অরূপ চন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০।

২৫. রমাপ্রসাদ বাঙ্কর, মুর্শিদাবাদ মণীষা (প্রথম খন্ড), খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, ২০১১, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

২৬. রবীন্দ্রনাথ দাস, ইতিহাসের আলোকে মুর্শিদাবাদ, রোহিণী নন্দন, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১২২-১৩৪।

২৭ অরূপচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।

২৮. বিজয়কুমার বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩১-৩৩২।

২৯. তদেব পৃ. ৩৩২।

৩০. কিশোরকুমার রায়চৌধুরী, 'মুর্শিদাবাদে শিল্পায়ন সম্ভাবনা', শারদীয় মুর্শিদাবাদ সন্দেশ ১৪০২, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, পৃ. ৬১-৬৬।

এই সংখ্যাটি যুগ্ম সংখ্যা। পরবর্তী সংখ্যা মার্চ মাসে প্রকাশিত হবে।

ছোটোগল্প

সুমিতার দর্শন

ভক্তিপদ দে

সরোজকুমার দে। বি.এ পাশ করার পর তার বেকার অবস্থায় নিজেদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকার জন্য কয়েকটি বাড়িতে ছাত্রছাত্রীদের গৃহশিক্ষকতা করতে শুরু করে। এই গৃহশিক্ষকতা করা কালীন সরোজের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় কৃষেন্দু দত্তের বিশেষ অনুরোধে তাঁর এক মেয়ে তপতী ও তিন ছেলে মানবেন্দ্র, অলকেন্দু এবং নভেন্দুর গৃহশিক্ষকতা করতে শুরু করল। অবসর সময়ে একটা চাকরি পাওয়ার জন্য নানান সরকারি, বেসরকারি সংস্থায় দরখাস্ত, পরীক্ষা, ইন্টারভিউ দিতে লাগল।

সরোজ ছাত্রছাত্রীদের খুব আপন করে নিত এবং খুব যত্নের সঙ্গে পড়াত। তাঁর আত্মীয়ের চার ছেলেমেয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই সরোজদার ভক্ত হয়ে উঠল। গৃহশিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের এক সুসম্পর্ক গড়ে উঠল। এরা সকলে সরোজকে সরোজদা বলেই ডাকত। সরোজের চাকুরি পেতে একটু দেরি হয়েছে, তবু তার গৃহশিক্ষকতা করার জন্য হাতে অর্থ না থাকার অভাব বোধ করতে হয়নি।

সরোজ কয়েক বছরের মধ্যেই একটা সরকারি চাকরিতে যোগদান করল। ইতিমধ্যে তপতী, মানবেন্দ্র এবং অলকেন্দু পাশ করে স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে গেছে। সরোজও নিজের বাড়ি থেকে বেশ দূরে চাকরি করতে যেত বলে, আর কোনও বাড়ি গিয়ে গৃহশিক্ষকতা করতে সময় পেত না। অফিস যাবার আগে সকাল নটার মধ্যে নিজের বাড়িতে পড়িয়ে অফিস চলে যেত।

আবার অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে পড়াত। এই ছাত্রছাত্রী পড়ানটা ঠিক তার পেশা নয় যেন ছিল এক নেশা।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে, সরোজদা তার বিয়েতে তার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের নিমন্ত্রণ করেছিল।

মানবেন্দ্র অলকেন্দু এবং নভেন্দু তার বিয়ের বৌভাত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। কেবলমাত্র তপতীর কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বলে সে আসতে পারে নি।

ইতিমধ্যে কয়েক বছর কেটে গেছে, এদের অনেকের বিয়েও হয়ে গেছে।

সরোজ তাঁর একমাত্র শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে নন্দিতার শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রগুলো একটা পুরানো ফলিও ব্যাগে করে নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়ে ছিল। যাবার পথে পড়ল বেনেপুকুর বাজার। এই বাজারের কাছাকাছি অমলেন্দুদের পৈত্রিক বাড়িতে থাকে তিন ভাই। বছর দুয়েক হল এদের বাবা-মা দুজনেই গত হয়েছেন।

সরোজ ছাত্রছাত্রীদের খুব আপন করে নিত এবং খুব যত্নের সঙ্গে পড়াত। তাঁর আত্মীয়ের চার ছেলেমেয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই সরোজদার ভক্ত হয়ে উঠল।

অমলেন্দুদের বাড়িতে ঢুকলেন তাদের নিমন্ত্রণ করার জন্য। কয়েকবার কলিংবেল টেপার পর দোতলার বারান্দার এবং গেটের লাইট জ্বলে উঠল। অমলেন্দুর বি.এ পাশ করা আধুনিক স্ত্রী মনে মনে ভাবলেন, এই অসময়ে কে আবার জ্বালাতন করতে এল।

অতি সাধারণ পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে দেখে কোনও অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তি মনে করে চিৎকার করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাকে খুঁজছেন?

সরোজ বললেন, আমি অমলেন্দুর সঙ্গে এক বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে চাই। ও কি বাড়িতে আছে? অমলেন্দুর স্ত্রী সুমিতা বললেন, হ্যাঁ উনি বাড়ি আছেন। সরোজ বললেন, তাহলে আপনি দয়া করে ওকে একটু ডেকে দেবেন? সুমিতা বললেন, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি দেখছি। সুমিতা সরোজকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নামটা কি? — সরোজদা বললেই বুঝতে পারবে।

ঘরে সোফায় বসে অমলেন্দু দত্ত। সকালে অফিস যাবার তাড়ায় সংবাদপত্রটা ভাল করে পড়া হয়নি বলে মন দিয়ে তা পড়ছিলেন। সুমিতা স্বামীকে গিয়ে বললেন, দেখ তো বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে কে একজন সরোজদা তোমায় ডাকছে। লোকটার পরনের জামাপ্যান্ট তেমন ভাল না। সরোজ যে কোনওকালেই বিলাসিতা পছন্দ করেন না একথা সুমিতার জানা ছিল না।

অমলেন্দু সরোজদার নাম শুনে ব্যস্ত হয়ে সুমিতাকে জিজ্ঞাসা করল, সরোজদা কোথায়? আরে ওনাকে ভেতরে ডাকো। সুমিতা বলল অমলেন্দুকে, তুমি ডাকো গে যাও। অমলেন্দু সিঁড়ি থেকে নেমে গ্রীলের দরজার তালা খুলে দেবার আগেই বলে উঠল, আরে সরোজদা যে! এতদিন কোথায় ছিলে গো। অনেকদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হল। এস এস, ভেতরে এস। অমলেন্দু সরোজদাকে সোফায় বসাল। নানা কথাবার্তা হল। অমলেন্দু সরোজদাকে জিজ্ঞাসা করল, সরোজদা কেমন আছ? তুমি সেই কবে আমাদের পড়ানো ছেড়ে দিয়েছ, আজও তোমার কথা মনে পড়ে। সরোজদা অমলেন্দুকে বললেন, শুনেছিলাম তোর মেয়ে ইউনাইটেড মিশনারী থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করেছিল। এখন কি করছে? অমলেন্দু বলল, সরোজদা আমার মেয়ে মিলির কথা আর বলনা। ওর মা এবং আমি মেয়েকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। তা আমাদের পূর্ণ হল না। সবই যেন ভস্মে ঘি ঢালা হয়ে গেল। আগে তো আমরা মেয়েকে কারোর সঙ্গে মিশতে এবং কথা বলতে দিতাম না। রাস্তায় বেরোতে দিতাম না। স্কুল বাসে যাতায়াত করত। স্কুলবাস বড় রাস্তায় নামিয়ে দিলে ওর মা নিয়ে আসত। আর স্কুলে যাবার সময় স্কুল বাসে তুলে দিয়ে আসত। কলেজে ভর্তি হবার পর একা একাই বাসে কলেজ যেত। একা একাই অধ্যাপকদের বাড়িতে পড়তে যেতে হত। সেই সময় একজন সুদর্শন যুবকের প্রেমে পড়ে। আর ওই যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ওদের বাড়িতে ওঠে। তারপর আমাদের জানায়। মেয়ের এমন কান্ডকারখানা দেখে আমরা তো ভীষণ আশ্চর্য হই। অবশেষে দুই পরিবারের দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার মাধ্যমে উভয় পক্ষই এই বিয়ে মেনে নিতে বাধ্য হই।

স্কুলবাস বড় রাস্তায় নামিয়ে দিলে ওর মা নিয়ে আসত। আর স্কুলে যাবার সময় স্কুল বাসে তুলে দিয়ে আসত। কলেজে ভর্তি হবার পর একা একাই বাসে কলেজ যেত।

সরোজদা অমলেন্দুর মুখ থেকে এ সমস্ত কথা শুনে বলল, আমি সব জানি।

অমলেন্দু এবার বলল, মিলির বিয়েটা আমি আত্মীয়-স্বজনদের কাছে প্রকাশ করার জন্য তাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে এক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করেছিলাম। সরোজদা ওই সময়ে তোমার অনেক খোঁজ করেছিলাম। তোমার কোনও খোঁজ পাইনি। সরোজদা বললেন, তুই যে

সময়টার কথা বলছিস, তখন আমি অফিস থেকে মাস খানেকের জন্য ছুটি নিয়ে তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে ছিলাম। তাই কলকাতায় ছিলাম না।

সরোজদা বললেন, দেখ অমলেন্দু, যা ঘটার তা ঘটবেই। আমাদের হাতে কিছু নেই। পাশের ঘর থেকে অমলেন্দুর স্ত্রী সুমিতা সব কথা শুনছিল। মেয়ের বিয়ের বিষয়ে অমলেন্দু সব প্রকাশ করাতে মনে মনে ভারি অসন্তুষ্ট হচ্ছিল। তাই পাশের ঘর থেকে ডাকল, 'অলোক একটু শোনো তো, দরকার আছে।'

অলোক অমলেন্দুর ডাক নাম।

অমলেন্দু সরোজদাকে বলল, 'সরোজদা এক মিনিট, পাশের ঘর থেকে আসছি।'

অলোক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'সুমি, তুমি আমায় ডাকছ?' সুমি অলোকের প্রতি বেশ খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, 'তুমি একটা হাঁদারাম, মাথামোটা। কার কাছে কোন কথা বলতে হয়, আর কার কাছে বলতে নেই তা তুমি জানো না। ওনার কাছে অতশত বলার, ব্যাখ্যা করার কি দরকার? অনেকক্ষণ তো তোমাদের মধ্যে বকবকানি চলছে, এবারে একটু থামো না। উনি কেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান, সেটা শুনে নিয়ে বিদেয় কর না। আর ভাল লাগছে না, একেবারে অসহ্য।

অমলেন্দু বৌয়ের ওপর রাগ দেখিয়ে বলল, 'সুমি, বাজে কথা বলো না। ওনাকে তুমি চেন? ওনার সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জান? সুমি বলল, আমার চেনারও দরকার নেই, আর জানারও দরকার নেই। তুমি যা খুশি কর। আমি কিছু বলব না।'

পাশের ঘর থেকে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অমলেন্দু হাসি মুখে সরোজদার পাশে এসে বসল। তারপর বলল, সরোজদা, আর কি বলছিলে বল?' সরোজদা মিথ্যা হাসি মুখ দেখিয়ে বললেন, আর কিছু বলার নেই রে, এবার উঠি। তোর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। অমলেন্দু বলল, না, না সরোজদা একি কথা! কমপক্ষে এক কাপ চা আর বিস্কুট খেয়ে যাও। সরোজদা ঠান্ডা মাথায় হাসি মুখে বললেন, আজ রাত হয়ে গেছে। খাব না। অন্য একদিন এসে খেয়ে যাব। আজ আসি। তুই বৌমাকে একটু ডাক না। ওকে নিজে মুখে বলে যাই। অমলেন্দু এই ঘর থেকে বলল, সুমি, তুমি এখানে একটু এসো তো, সরোজদা তোমাকে একটু বলে যাবেন। সুমিতা সুসজ্জিত হয়ে পাশের ঘরেই ছিল। এ-ঘরে আসতে সরোজদা বললেন, বৌমা অতি অবশ্যই আমার মেয়ের বিয়েতে অমলেন্দুর সঙ্গে যেও। সুমিতা বলল, 'যাব।' এতক্ষণ পরে সুমিতা বলল, 'আপনি কিছু না খেয়ে চলে যাবেন?'। সরোজদা বললেন, 'থাক বৌমা, আজ কিছু খাব না। অন্যদিন হবে খন, সরোজদা চলে যাবার পর, অমলেন্দু সুমিতাকে বলল, 'সরোজদা আমাদের পড়িয়েছেন। আমরা ওনার কাছে পড়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছিলাম। উনি আমাদের শুধু আত্মীয়ই নন, উনি আমাদের গৃহশিক্ষক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। উনি জীবনে অনেক কষ্ট করে উন্নতি করেছেন। তুমি ভাবলে কি করে যে উনি আমার কাছে নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য চাইতে এসেছেন। ওনার কি পয়সার অভাব? পোশাক আর চেহারা দেখে ওনাকে চেনা যায় না। মানুষের মন আর ব্যবহারটা বুঝতে হয়। উনি একজন উদার মনের মানুষ। আমাদের সকলকে অনেক উপহার দিয়েছিলেন।'

পাশের ঘর থেকে অমলেন্দুর স্ত্রী সুমিতা সব কথা শুনছিল। মেয়ের বিয়ের বিষয়ে অমলেন্দু সব প্রকাশ করাতে মনে মনে ভারি অসন্তুষ্ট হচ্ছিল। তাই পাশের ঘর থেকে ডাকল, 'অলোক একটু শোনো তো, দরকার আছে।'

সুমি তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বীকার করল, বলল যে সে না বুঝে ভুল করেছে। অমলেন্দু বলল, 'তুমি কিছুই বুঝতে পার না। তোমার এই না-বুঝতে পারা আর অহংকারের জন্য মিলির এমনটা হল।'

সুমিতা বলল, চল, এখন খেতে চল। খেতে খেতে সুমিতা অমলেন্দুকে বলল, আমি বলছিলাম কি আগামী ফাল্গুনে আমার বোন অমিতার বিয়ে। সেখানে বড় জামাই হিসেবে তোমার মোটা টাকা খরচ আছে। পরের বছর মাঘ মাসে আমার ভাই সৌজাত্যের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। তখন তোমার মোটা টাকা খরচ হবে। এর মাঝে আমাদের কিছু কেনাকাটা আছে। সেইজন্যই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছিলাম যে কেউ সাহায্য চাইলেই তাকে আর্থিক সাহায্য কর না। আমাদের তো কিছু সঞ্চয় করতে হবে। বোন আর ভাইয়ের বিয়েতে সবচেয়ে ভালো সোনার গয়না উপহার দিতে না পারলে, আমি বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের কাছে মুখ দেখাব কি করে?

আমার বাবা বেঁচে থাকলে এতটা ভাবতাম না। সকলেই জানে তুমি কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার। তার জন্য আমার অসহায় বিধবা মা তোমার ওপর অনেক ভরসা রাখে। প্রয়োজনে তোমাকে এখানে আর্থিক সাহায্যও করতে হতে পারে। তাই তো মা বলেন, আমার বড় জামাই অমলেন্দু আমার বড় ছেলের কর্তব্য করে।

সুমিতা স্বামীকে একটু খোসামোদ করার জন্য বলল, অলোক, তোমার হাত যে লম্বা, অভাবগ্রস্ত লোক দেখলে তাকে যে তুমি কোনও আর্থিক সাহায্য না করে থাকতে পার না, সে কথা তো অনেকেই জানে। আমার সামনে যাকে যা দাও তা তো আমারও চোখে পড়ে। আমার আড়ালে যে কাকে কি দান করছ তা আমি জানতে পারছি না। এই তো সেদিন ব্যাঙ্কে যাচ্ছিলাম। আমাদের বাড়িতে আগে যে কাজ করত শিবুর মা আমার সঙ্গে দেখা হতে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করল। বলল, বাবু কেমন আছে মা? আমি বললাম ভালো আছে। সঙ্গে সঙ্গে শিবুর মা বলল, 'বাবু ভাল থাক, সুখে থাক। ভগবান ওর মঙ্গল করুক। বড্ড উপকারী মানুষ। আমার ছোট মেয়ে শম্পার বিয়েতে ওনাকে কিছু সাহায্যের কথা বলতেই বলল, শিবুর মা, কাল সকাল দশটার সময় অফিস যাবার পথে তোমাকে কিছু দিয়ে যাব। তুমি ঠিক এই জায়গাতেই আমার জন্য দাঁড়িয়ে থেকো।

বাবু ঠিক পরের দিন আমাকে দেখতে পেয়ে এক গোছা টাকা একটা কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিয়ে বলল, বাড়ি নিয়ে চলে যাও। এখানে গোনাগুনি করবে না। বাড়ি গিয়ে খুলবে। গুণে দেখি, পুরো পাঁচ হাজার টাকা! শিবুর মা বলল, বৌদিমণি, বাবু বড্ড ভালমানুষ। আমি আসছি বলে ব্যাঙ্কে চলে গেলাম। এই কথাটা কি তুমি আমাকে বলেছ? অমলেন্দু বলল, আমি কি কোনও খারাপ কাজ করেছি যে তোমাকে বলব। শুনে তুমি খুশি হবে না, তাই বলিনি।

সুমিতা স্বামীকে একটু খোসামোদ করার জন্য বলল, অলোক, তোমার হাত যে লম্বা, অভাবগ্রস্ত লোক দেখলে তাকে যে তুমি কোনও আর্থিক সাহায্য না করে থাকতে পার না, সে কথা তো অনেকেই জানে।

অমলেন্দু স্ত্রীকে বলল, দান-ধ্যান করা একটু ভাল। ঈশ্বর তাতে খুশি হন।

স্বার্থপর সুমিতা শুধু নিজের এবং নিজের বাপের বাড়ির দিকটাই দেখে আর কারোর প্রয়োজনের কথা ভাবতে চায় না, কাউকে কিছু দিতেও চায় না, সুমিতা বেনে পাড়ার সুন্দরী অহংকারী মেয়ে। অমলেন্দু দত্তের সঙ্গে প্রেম করে তার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি আসার

পর থেকে বছর কাটতে না-কাটতে তিন ভাই আর শ্বশুর-শাশুড়ীর যৌথ পরিবারে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অশান্তি লেগেই থাকত, সেইজন্য দাদা আর ছোট ভায়ের পরিবার তাদের বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর নিজেদের ঘরে তালা দিয়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করছে। বর্তমানে অমলেন্দু তাদের পৈত্রিক বাড়িতে তার স্ত্রীকে নিয়ে একাই থাকে। কারোর সঙ্গে সু-সম্পর্ক নেই।

দেখতে দেখতে সরোজদার মেয়ের বিয়ের শুভ দিনটা এসে গেল। অমলেন্দু অফিস যাবার সময় সুমিতা তার স্বামীকে বলল, 'অলোক, আজ কিন্তু বিয়েবাড়ি আছে, তাড়াতাড়ি বেরোব। তুমি কিন্তু আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে এস। অমলেন্দু যাবার সময় বলে গেল, 'চেষ্টা করব'। সুমিতা বলল, আবার 'চেষ্টা' কেন? তুমি একজন অতবড় অফিসার, ইচ্ছা করলে একদিন একটু আগে আমার জন্য বাড়ি চলে আসতে পারো না! লক্ষ্মীটি এস।' খানিকটা স্ট্রেন অমলেন্দু বলল, 'ঠিক আছে আসব।' সেই বিকাল থেকে আলমারি ঘেঁটে ঘেঁটে বছর খানেক আগে মিলির বিয়ের প্রায় একমাস পরে লোক দেখানোর জন্য নতুন করে বিয়ের অনুষ্ঠান করা হয়েছিল,সেই অনুষ্ঠানে মিলি নিমন্ত্রিত অতিথিদের হাত থেকে যে সমস্ত দামি দামি শাড়ি আর গয়নাগুলো উপহার হিসেবে পেয়েছিল সেগুলোর মধ্যে নিজের যেগুলো ভারি পছন্দ হয়েছিল সেগুলো মেয়েকে না দিয়ে নিজের ব্যবহারের জন্য রেখে দিয়েছিল। মায়ের কড়া শাসন আর নজরদারির জন্য মিলি তার কুমারী অবস্থায় মায়ের মুখের ওপর ভয়ে তার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেনি, আজও করতে সাহস পায় না। সে তার মাকে বাঘিনীর মত ভয় পেত। সুমিতা পড়াশোনার খুব অনুরাগিনী। সংসারে রাতের রান্নাবান্না সিকেয় তুলে দিয়ে মা, বাবা আর মেয়ে ছাতু খেয়ে অনেকদিন রাত কাটিয়েছে, তবুও মিলির কাছ থেকে সমস্ত পড়া আদায় করে ছেড়েছে। অমলেন্দু কোনও প্রতিবাদ করেনি। মেয়ে মায়ের ভয়ে যেন সদাই জড়সড়। একদিন অমলেন্দু তার স্ত্রীকে বলল, 'দেখ সুমি, পেট ভর্তি না থাকলে মাথায় পড়া ঢোকে না।' মিলির মা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল, 'মিলি, কান খুলে শুনে নাও, তুমি কলকাতার বিখ্যাত ইউনাইডেট মিশনারী স্কুলের মেধাবি ছাত্রী। তোমাকে প্রতি ক্লাসে ফার্স্ট হতে হবে, তা না-হলে তোমার জন্য আমার কড়া শাস্তি তোলা থাকবে।'

মিলি কৌতূহলবশত সরল মনে বোকার মত মাকে প্রশ্ন করল, 'মা তুমি কোনওদিন ফার্স্ট হয়েছ? মেয়ের মুখ থেকে এতবড় কথা শুনে সুমিতা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে মেয়ের গালে রাগের মাথায় ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে দিল। রেগে-মেগে বলল, 'তা তুই জেনে কি করবি, আমি না হই, তোর বাবা তো ফার্স্ট হয়েছে।'

মায়ের হাতে চড় খেয়ে যেদিন তার গালটা লাল হয়ে গিয়ে জ্বালা-জ্বালা করছিল, সেদিনটার কথা মিলির আজও মনে পড়ে। মেয়ে মিলির ওপর সুমিতার অতিরিক্ত কড়া শাসন এবং নজরদারি অবশেষে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোতে পরিণত হয়েছিল। সুমিতা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে, মিলি সৌমিত্রের প্রেমের বাঁধনে বাবা-মাকে না জানিয়ে পালিয়ে কালিঘাটে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি উঠবে এবং অহংকারী মায়ের এবং নিরীহ বাবার মুখে চুন-কালি লেপে দেবে। এখন থাক সে সব পুরানো কথা, যা ঘটার তা ঘটে গেছে।

অমলেন্দু অফিস যাবার সময় সুমিতা তার স্বামীকে বলল, 'অলোক, আজ কিন্তু বিয়েবাড়ি আছে, তাড়াতাড়ি বেরোব। তুমি কিন্তু আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি চলে এস।

সুমিতা তার খুব পছন্দের শাড়ি ব্লাউজ এবং দামি দামি হাল ফ্যাসানের গয়না পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেন্ট মাখার জন্য বিদেশি সেন্টের শিশিটা নিতে যাবে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। ভাবল অমলেন্দু এসে পড়েছে। খুশি হয়ে চাবি খুলতে গিয়ে দেখল তার বোন অমিতা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সুমিতা নিজের বোনকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুই এখন? আমরা যে বিয়েবাড়ি বেরচ্ছি।' অমিতা বলল, 'আমিও আমার বান্ধবী মঞ্জুশ্রীর বিয়েতে যাব, সেজন্য তোর কাছ থেকে একটা ভাল শাড়ি আর একটা হার চাইতে এসেছি। দে দিদি, আমার হাতে সময় নেই। আমার দুজন বান্ধবী বাড়িতে বসে আছে।'

দিদি বলল, 'সকালে আসতে পারলি না, এই অসময়ে এলি! তোর জামাইবাবু আগে এসে পড়লে তো আমরা বিয়েবাড়িতে বেরিয়ে যেতাম! আমাকে রেডি হয়ে থাকতে বলেছে।'

বোনের হাতে একটা ভাল শাড়ি এবং সুমিতার অপছন্দের একটা সোনার হার তুলে দিল। বোনও আর দেরি না-করে ওগুলো নিয়ে চলে গেল। যাবার পথে জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে অমিতা জামাইবাবুকে বলল, 'দিদি কতক্ষণ ধরে বিয়েবাড়ি যাবে বলে সেজেগুজে বসে আছে। বাড়ি যান, দিদি ভয়ানক রেগে রয়েছে।' অমলেন্দু শালিকাকে একটু হেসে বলল, 'এই জন্যই তো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছি।' অমিতা বলল, 'আমারও বিয়েবাড়ি যাবার তাড়া আছে। পরে কথা হবে, এখন আসি।'

অমলেন্দু বাড়ি ঢুকতেই সুমিতা বলল, 'এই তোমার তাড়াতাড়ি আসা! সেই কখন থেকে সেজেগুজে বসে বসে ঘামছি। একবার মনে হচ্ছিল, বিয়েবাড়ি যাব না। শাড়ি-গয়নাগুলো খুলে ফেলি।' অমলেন্দু কথা না-বাড়িয়ে বলল, 'বেশি রাত তো হয়নি, সবে পৌনে সাতটা। বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান বাড়িটা বেশি দূরে নয়। সরোজদা ইস্টার্ন বাইপাসের ধারেই একটা বড় হোটেল আছে সেটা ভাড়া নিয়েছে। নিমন্ত্রণপত্রে তো হোটেলটার নাম লেখা আছে 'লারিকা হোটেল'। সুমিতা বলল, 'একবার দেখেছিলাম অত মনে নেই।'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি। দাড়ি তো সকালেই শেভ করেছি। আমার গরদের পাঞ্জাবি, গেঞ্জি, ধুতি, সোনার আংটি, বোতাম ও হার বের করে রেখেছো তো?' সুমিতা বলল, 'সব বার করা আছে, তুমি এখন নাও।' অমলেন্দু বলল, 'সুমি, এককাপ চা, চারটে বিস্কুট হলে ভাল হত।' সুমিতা বলল, 'ওই ফ্লাক্স-এ করে রেখেছি। কাপে চা ঢেলে নিয়ে বিস্কুট দিয়ে খাও। আমি আর ঢালছি না, চা পড়ে গিয়ে যদি আমার দামি শাড়িটা নষ্ট হয়ে যায়।' অমলেন্দু সেজেগুজে স্ত্রীকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে এসে পৌঁছল লারিকা হোটেলের সামনে। সানাইয়ের সুর শুনে, নানান বাহারি রং-এর ফুল দিয়ে সাজান গেটে শুভবিবাহ, নন্দিতা ও কৌস্তভ লেখা দেখে বিয়েবাড়িতে প্রবেশ করল। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এক সুন্দরী তরুণী প্রতিটি নিমন্ত্রিত অতিথিদের গোলাপ ফুল, সুগন্ধী আতর জল আতরদানি থেকে ছিটিয়ে স্বাগত জানাচ্ছিল। অতিথিদের আসন গ্রহণের জন্য বড় বড় অনেকগুলো সোফা পাতা আছে। বিয়ে বাড়ির বিরাট বড় হলঘরটি নানান রকম ফুলের গোছা এবং মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। হলঘরের ভেতরে ছোট বড় নানান

অমলেন্দু বাড়ি ঢুকতেই সুমিতা বলল, 'এই তোমার তাড়াতাড়ি আসা! সেই কখন থেকে সেজেগুজে বসে বসে ঘামছি। একবার মনে হচ্ছিল, বিয়েবাড়ি যাব না।

আকারের আলোর ঝাড় ঝুলছে। সোফায় নিমন্ত্রিত অতিথি এবং সম্মানীয় ব্যক্তিরা বসে আছেন। বিশেষ করে সরোজ যে আদালতে চাকরি করতেন, সেই আদালতের কয়েকজন সম্মানীয় জজ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। সরোজদা অমলেন্দুকে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সরোজদা বললেন, 'এ হচ্ছে আমার এক ভাই, অমলেন্দু।'

একদিকে কনের সিংহাসনে কনে সেজে সরোজদার মেয়ে নন্দিতা বসে আছে। তার আশেপাশে বসে রয়েছে তার কলেজের এবং অফিসের বন্ধু-বান্ধবীরা। নিমন্ত্রিত অতিথিরা তার হাতে প্রীতি উপহার তুলে দিচ্ছেন।

সুসজ্জিতা সুমিতা সবই ভালভাবে লক্ষ করে চলেছে। ইতিমধ্যে বিয়ে বাড়িতে রব উঠল, বর এসেছে, বর এসেছে। মেয়ের মা, কাকিমা, পিসিমারা শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বরণ করে বরকে বরাসনে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বরের কয়েকজন বন্ধু, বরের গাড়িতে এসেছিলেন, তাদেরকেও বরের পাশে বসবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল।

সকলেই বর দেখতে ছুটে গেল। বর দেখে সকলেই খুব খুশি। সুমিতা বর দেখে স্বামীর কাছে মন্তব্য করল, বর নয় তো, যেন রাজপুত্র বা ময়ূর ছাড়া কার্তিকও বলা যায়—তাই না অলোক! অলোক স্ত্রীর কথার কোনও উত্তর দিল না। আবার সুমিতা অমলেন্দুকে বলল, 'মেয়েটার কপালে বেশ ভাল বর জুটেছে। তোমার সরোজদার মেয়ের কপালটা বেশ ভাল।'

অমলেন্দু সুমিতাকে বলল, 'মেয়েটা কার দেখতে হবে তো। লড়াকু সরোজদার লড়াকু মেয়ে। সৎ মানুষদের মেয়ের ভাগ্য ভালই হয়। সততার একটা আলাদা পাওনা থাকে।' সুমিতা তখন সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামীকে ফোঁস করে উঠে বলল, 'অমলেন্দু, তাহলে আমরা কি সব অসৎ?' অমলেন্দু দেখল তার স্ত্রী সুমিতাকে এই বিষয়টা বোঝান যাবে না। তাই নরম সুরে বলল, 'তা নয়, তবে সবই কপাল আর ভাগ্য।'

সুমিতা বলল, 'তোমার সরোজদার পক্ষে এমন সুপাত্র জোগাড় করা সম্ভব হয় নি। নিশ্চয়ই লাভ-ম্যারেজ।' অমলেন্দু স্ত্রীকে বলল, 'তুমি এত বুদ্ধিমতি, এটা যে লাভ-ম্যারেজ এটা বুঝতে তোমার ষোল দিন লেগে গেল! সরোজদা মেয়ের বিয়ের পনেরো দিন আগে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে গেছেন। ওখানে তো লেখাই আছে পাত্রের নাম কৌস্তভ মুখার্জি আর পাত্রীর নাম নন্দিতা দে। এর থেকেই তো বোঝা যায়। এতে দোষ কোথায়! আমাদেরও লাভ ম্যারেজ আর আমাদের মেয়ে মিলিরও লাভ-ম্যারেজ। ভালবাসা কোনও অপরাধ নয়।'

অমলেন্দু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ে দেখবে, না উপহারটা নন্দিতার হাতে তুলে দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি ফিরে যাব?' সুমিতা কৌতূহলবশত বলল, 'এখন খেতে যাব না। ওই মালাবদল পর্যন্ত দেখে তারপর খেতে যাব।' সুমিতা অন্যদের বিয়ে দেখতে খুব ভালবাসে। কোন মেয়ের বর কেমন হল, কোন ছেলের বউ কেমন হল---এ বিষয়ে খুব আগ্রহ।

তাই এই বিয়ে বাড়িতে যাদের চোখে পড়ল, তাদের সাজ-পোষাক, অলঙ্কার, কে সোনার গয়না পরেছে, কে ইমিটেশন পরেছে তাই ভাল করে লক্ষ করে মালাবদল পর্যন্ত বিবাহস্থলে থেকে সুমিতা তার প্রাণাধিক অমলেন্দুকে নিয়ে

অমলেন্দু সুমিতাকে বলল, 'মেয়েটা কার দেখতে হবে তো। লড়াকু সরোজদার লড়াকু মেয়ে। সৎ মানুষদের মেয়ের ভাগ্য ভালই হয়। সততার একটা আলাদা পাওনা থাকে।'

যেখানে খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে দিয়ে দেখল, সরোজদা নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য পংক্তিতে বসে এবং বুফে সিস্টেমেও খাবার ব্যবস্থা করেছেন।

অমলেন্দু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'সুমিতা বসে খাবে, না চেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে খাবে?' সুমিতার কি খেয়াল হল, বলল, 'বসেই খাব। এই ব্যাচটা উঠলেই বসে যাব।' সেটাই হল, ওরা স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি খেতে বসল। এই বিয়ে বাড়ির খাদ্য তালিকায় যে সব পদ ছিল, তার বেশিরভাগই সুমিতার অতি প্রিয় খাদ্য। যেমন মটন বিরিয়ানি, খাসির মাংস, ফিস মুনিয়া, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, গোলাপজাম, নলেন গুড়ের কাঁচা গোল্লা, আইসক্রীম আরও কত!

সুমিতা বিয়ে বাড়ির আলোকসজ্জা দেখেও খুব মুগ্ধ হয়েছিল। বিয়ে বাড়ির ঠিক পাশে যে বোটিং রিসর্টটা ছিল, সেই বৃহৎ সরোবরের জলে বিয়ে বাড়ির আলোক মালার ছবি স্পষ্ট হয়ে যেন ভাসছিল। এই দৃশ্য সুমিতাকে আরও বেশি মুগ্ধ করেছিল।

সরোজদার মেয়ের বিয়েতে অমলেন্দুর দাদা, ছোট ভাই আর ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় অমলেন্দু এবং সুমিতা কথা না-বলে একেবারে এড়িয়ে যেতে পারল না। সরোজদা যে তাদেরও নিমন্ত্রণ করেছিলেন, এ-কথা ওরা জানত না। জানলে হয়ত অমলেন্দু আর সুমিতা নন্দিতার বিয়েতে আসত না।

বাড়ি ফেরার সময়ে সুমিতা আর অমলেন্দু গদগদভাবে তৃপ্তির হাসি হেসে সরোজদা আর মৃন্ময়ী বৌদিকে বলে গেল, 'আসছি।' সরোজদা সুমিতাকে বলল, 'বৌমা ঠিকভাবে তোমরা খাওয়া-দাওয়া করেছ তো? আসতে কোনও অসুবিধা হয়নি তো?' অমলেন্দু এবং সুমিতা দুজনেই একযোগে বলল, 'খুব ভালভাবে খেয়েছি। প্রতিটি আইটেম খুব ভাল হয়েছে। আমাদের আসতে কোনও অসুবিধা হয়নি। এ তো আমাদের চেনা জায়গা। আগে আমরা এই বোটিং রিসর্টে কতবার এসেছি।' সরোজদা বললেন, 'তাহলে তো বেশ ভালই হয়েছে। তোমরা তোমাদের চেনা জায়গাটা আবার একবার দেখে গেলে।'

অমলেন্দু কিছুটা সরোজদার কথার অর্থ বুঝতে পেরে বলল, 'সরোজদা তুমি যাও। অন্য সব অতিথিদের আপ্যায়ন কর। দেখাশোনা কর। আমরা আসছি।' সরোজদা বললেন, 'তোরা দেখেশুনে বাড়ি যাস।'

পথে যেতে যেতে অমলেন্দু সুমিতাকে জিজ্ঞাসা করল, 'সুমিতা, এই বিয়ে বাড়ির ব্যবস্থা দেখে সরোজদাকে কি বুঝলে?' সুমিতা বলল, 'এখন বুঝলাম, কেন সরোজদা তোমার এত প্রিয়। উনি সুবিবেচক, কর্তব্য পরায়ণ, উদার মনের, মাথা উঁচু করে চলার মানুষ। ওই মানুষটাকে দেখে কিন্তু কিছু বোঝা যায় নি।' অমলেন্দু বলল, এরই নাম সরোজদা। ওনার শিক্ষার দৌলতে আজ আমি করে খাচ্ছি।' সুমিতা অমলেন্দুকে বলল, 'আমি ওনাকে প্রথমে ভুল বুঝেছিলাম বলে আমাকে ক্ষমা করে দিও।'

মানুষীর বইঘর শুরু করতে চলেছে গল্প বলার ক্লাস। স্কুলে ক্লাসের ফাঁকে গল্প শুনবে স্কুল পড়ুয়ারা। প্রশ্নের উত্তর দেবে। মাসের শেষে সেরা ছাত্র পুরষ্কার জিতে নেবে। ছাত্ররাও যদি আগ্রহী হয় গল্প বলবে।

বিশেষ নিবন্ধ

হেদুয়া কাইট, দিলীপকুমার ও একচিলতে আকাশ

আজকের ভিডিও গেমে সেদিনের ঘুড়ির খেলা কী হারিয়ে যাবে? লিখলেন অময় দেব রায়

হেদুয়া থেকে বিবেকানন্দের বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলে বিধান সরণীর দুপাশে তখন সারিসারি ঘুড়ির দোকন। কেষ্টকাইট, নিতাই কাইট, হারু কাইট, বেণী কাইট, বুবলু কাইট। বিশ্বকর্মা পুজো কিংবা অক্ষয় তৃতীয়ায় তো কথাই নেই, ভিড় জমত সারা বছর। দক্ষিণেশ্বর, বাগুইআটি, বারাসাতের মত দূরদূরান্ত থেকে জড়ো হতেন ঘুড়ি প্রেমীরা। উত্তর কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় জমে উঠত ঘুড়ির লড়াই। ভিডিও গেম কিংবা ব্লু-হোয়েলে মেতে ওঠা শৈশব তখন লাটাই, মাঞ্জা আর দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশে উড়ে বেড়াত। ঘুড়ি ছিল বাঙালি জীবনের রামধনু।

সেটা ১৯৬২ সাল। ঘুড়ির লড়াই শুনলেই তখন দুজন হাজির। কেষ্ট সিমানি ও নিতাই দাস। ঘুড়ি বানানো, মাঞ্জা দেওয়া আর টুর্নামেন্টে জিতে হৈহৈ করে ঘরে ফেরা, এই ছিল তাদের রোজকার রুটিন। ভালোবেসে ঘুড়ির দোকান খুলে বসলেন। কেষ্ট কাইট ও নিতাই কাইট। জারি থাকল হেলদি কম্পিটিশন। কেষ্ট একবার অলিম্পিক ঘুড়ি বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন (অলিম্পিক লোগোর মত রিং ঘুড়ি)। কিছুদিনের মধ্যেই নিতাই এর চমক-দোকানে এল নতুন ডিজাইন, উড়োজাহাজ ঘুড়ি। ঘুড়ির রং নিয়েও চলত হাজারও এক্সপেরিমেন্ট। লাফিয়ে বিক্রি বাড়তে লাগল। তাদের দেখাদেখি হাজির হলেন আরও অনেকে। দোকান বসালেন বেনী, হারু, বুবলুরা। একাধিক দোকান হলে কি হবে, বিক্রিতে এতটুকু ভাটা নেই। এমনই ছিল ঘুড়ি ওড়ানোর ধুম।

হারু, বুবলুদের দলে ভিড়ে গেলেন আর এক ঘুড়ি পাগল পূর্ণচন্দ্র দত্ত। যোগ হল নতুন আরেকটি দোকান। হেদুয়া কাইট। দোকান সাজানোয় পূর্ণচন্দ্রের জুড়ি মেলা ভার। রঙবেরঙের একেতে, দোতে, আধেতে ঘুড়িতে সাজানো থাকত হেদুয়া কাইট। চাকি ও চরকি লাটাই তো ছিলই। পূর্ণচন্দ্র আমদানি করলেন বড় বোমা লাটাই। মাড়সুদ্ধু আতপচালের ভাত, সাবু আর কাঁচ গুঁড়িয়ে নিজে হাতে লেই তৈরি করতেন। শেষে ছড়িয়ে দিতেন তচ মশলা। মাঞ্জা হত কড়কড়ে। সিজন টাইমে কতদিন যে রাত জেগে! ঘুড়ি বিক্রি করেছেন তখন কে ক'টা ঘুড়ি ধরল, কে ক'টা ঘুড়ি কাটাল এই নিয়ে মেতে থাকত গোটা পাড়া। রাতে বসত পিকনিক। কি সব দিন গেছে। বলছিলেন পূর্ণচন্দ্রের ছেলে গণপতি দত্ত। বাবার সঙ্গে থাকতে থাকতে ঘুড়ির প্রতি টান জন্মে গেল। আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে হেদুয়া কাইটই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু কোথায় গেল সেই সব রঙিন দিন। একমুখ দাড়ি গোঁফ। মিইয়ে যাওয়া শরীর। ঝাপসা চোখে এখন চারিদিক ফ্যাকাসে মনে হয়। চোখের সামনে একের পর এক দোকানগুলো ঝাঁপ বন্ধ হল।

কি সব দিন গেছে। বলছিলেন পূর্ণচন্দ্রের ছেলে গণপতি দত্ত। বাবার সঙ্গে থাকতে থাকতে ঘুড়ির প্রতি টান জন্মে গেল।

সময়টা ১৮৫৬ সাল। লক্ষ্ণৌ'র নিবাসিত নবাব এলেন কলকাতার মেটিয়াবুরুজে। নবাবের পিছুপিছু বিরিয়ানি তৈরির বাবুর্চি আর ঘুড়ির বাছাই কারিগর। সেই থেকে কলকাতায় ঘুড়ির রমরমা। কলকাতায় আকাশে উড়ল লক্ষ্ণৌর বিচিত্র সব ঘুড়ি। কিছু পরে এলেন বাবুরা। ঘুড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেল তাঁদের আভিজাত্য আর মান সম্মান। ঘুড়িকে ঘিরে দুহাতে পয়সা ওড়াতেন। লক্ষ্ণৌ কিংবা মুর্শিদাবাদ থেকে কারিগর এনে অর্ডার দিয়ে ঘুড়ি তৈরি হত। ঘুড়ি ছিল তাঁদের শৌখিনতার প্রতীক। সাতপাঁচ বলতে বলতে আক্ষেপ ঝরে পড়ে গণপতির গলায়। ''বছর আটেক আগেও অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না। টিফিনের পয়সা জমিয়ে ঘুড়ি কিনতে আসত পাড়ার ছেলে ছোকরারা। এখন কাঁধে ব্যাগ, হাতে মোবাইল, কানে হেডফোন। আমাদের বাঁচার উপায় আছে!" পুরোনো দিনের কথায় গণপতি বারবার ফিরে যান বাবার প্রসঙ্গে। দোকানে বাবার একটা বড়সড় ছবি টাঙানো - ''সেটা ৭৮ সাল। তখন ঘুড়ির যথেষ্ট রমরমা। একদিন সকালবেলা বাবা বেরিয়ে গেলেন। বোনকে বললেন-দরজাটা খোলা আছে, বন্ধ করে দিস। সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। তখন থেকে একা হাতে দোকান সামলাচ্ছি। ঘুড়ির ব্যবসা করে ছেলেপুলে বড় করেছি। দোকানের সঙ্গে এতদিনের সম্পর্ক। না-খেয়ে মরলেও হেদুয়া কাইট ছাড়তে পারব না।" সন্ধ্যের কলকাতায় তীক্ষ্ণ হর্নের শব্দে মিলিয়ে যায় গণপতির কথা। উঁচু উঁচু হাইরাইজের ফাঁকে তখন উঁকি দিচ্ছে এক চিলতে আকাশ।

সময়টা ১৮৫৬ সাল। লক্ষ্ণৌ'র নিবাসিত নবাব এলেন কলকাতার মেটিয়াবুরুজে। নবাবের পিছুপিছু বিরিয়ানি তৈরির বাবুর্চি আর ঘুড়ির বাছাই কারিগর।

বুবলু কাইট এখন রয়্যাল স্পুন, চাইনিজ রেঁস্তোরা। ঘুড়ির বদলে কোথাও সাইবার ক্যাফে। কোথাও আধুনিক গেজেটের পসরা। টিমটিম করে একা টিকে আছে হেদুয়া কাইট। গণপতির কথায়, ''কষ্ট হয়। আমি হেরে গেলে হেদুয়ায় আর একটাও ঘুড়ির দোকান বেচে থাকবে না।"

তখন বছরের বিভিন্ন সময়ে নক-আউট টুর্নামেন্ট হত। উত্তর কলকাতার গা-ঘেষাঘেষি বাড়ির ছাদ থেকে লাটাই ঘোরাতেন ওস্তাদ খিলাড়িরা। প্রত্যেক টুর্নামেন্টে থাকতেন একজন বিচারক। সবচেয়ে উঁচু ছাদ থেকে তিনি খেলার ওপর কড়া নজর রাখতেন। শীতের সময়ে ময়দানে জমে উঠত ঘুড়ির লড়াই। কলকাতার সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট। এখনও হয়। তবে সে জৌলুস আর নেই। একবার দিলীপকুমার এলেন ঘুড়ি ওড়াতে। শুনেই বাবার সঙ্গে ময়দানে হাঁটা লাগালেন গণপতি। ''সিনেমার নায়ক যে অমন ঘুড়ি পাগল হতে পারে কে জানত। সাতপ্যাঁচ, বাদামপ্যাঁচ সব তাঁর নখদর্পণে। লাটাই ছেড়ে সুতো ধরে ওড়াতে লাগলেন দিলীপকুমার। তাঁর প্যাঁচের যাদুতে অন্য সব ঘুড়ির তখন দফারফা। প্রিয় নায়ককে ঘিরে আছে ভক্তরা। মহুর্মুহু উঠছে হাততালি। সেসব কি ভোলা যায়।" ভয়ে ভয়ে নায়কের কাছে আবদার করলেন পূর্ণচন্দ্র। একবার হেদুয়া কাইটে ঘুরে যেতে হবে। কি আশ্চর্য। এক কথায় রাজি। দোকানে এসে নিজে হাতে নেড়েচেড়ে গোটা দশেক ঘুড়ি কিনলেন দিলীপকুমার। ততক্ষণে হেদুয়া জনঅরণ্য। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার হাত নাড়লেন ভক্তদের। গটগট করে হেঁটে গেলেন গাড়ির দিকে। সেবার ঘুড়িতে মজে থাকা কলকাতার মন জিতে নিয়েছিলেন বলিউডের ট্র্যাজেডি কিং।

হাসপাতালে বসে বসে...

দীর্ঘ প্রায় দুমাস সল্টলেকের বেসরকারি হাসপাতালে মায়ের অসুস্থতায় বসে থাকার অভিজ্ঞতা লিখলেন
প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরী

মা চলে গেছেন দিন পনেরো হল। তার আগে মার আর আমাদের লড়াইয়ের সময়ে যে অভিজ্ঞতা হল তা হয়ত অনেকেরই জীবনে হয় বা হয় না। তবু হাসপাতালে দিনের পর দিন বসে থাকার অভিজ্ঞতা না লিখে পারা গেল না। দেশের-রাজ্যের-বিদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হত, হাসপাতালে ভর্তি বা আউটডোরে দেখাতে আসা রুগীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। তাঁদের যে লড়াই লড়তে হয়েছে জীবনের কোনও না কোনও সময়ে বা এখনও লড়তে হচ্ছে সে সব কথা আজ বহু আলোচিত, কিন্তু এই সমস্যাকে দেখার ভঙ্গী সব মানুষের সমান নয়। এই দেখার তফাত কিছুটা নির্ভর করে সম্পর্কের ওপরও।

নিউ জার্সি থেকে মেয়ে এসেছেন বাবার জন্য। বেশি দিন থাকতে হবে বলে চাকরি ছেড়ে এসেছেন। মা আর মেয়ে সারাদিন বসে থাকেন, বাবা সিওপিডি পেশেন্ট, সি সি ইউ তে আছেন। কোনওদিন ভাল-কোনওদিন খারাপ। বসে থাকেন অপেক্ষায়, কি খবর আসে। ভদ্রলোক খেতে চান না, স্ত্রী ছাড়া কারুর হাতে খাবেন না। স্ত্রীর ডাক আসে ওপর থেকে, খাইয়ে বাড়ি ফেরেন। ভদ্রমহিলাও বয়স্ক, মনে হয় দেখে বড়ই দুঃসহ দিন কাটছে তাঁদের। তবুও আর্থিক অবস্থা বেসামাল নয়, তাই সামলে যাচ্ছেন।

তাঁদের যে লড়াই লড়তে হয়েছে জীবনের কোনও না কোনও সময়ে বা এখনও লড়তে হচ্ছে সে সব কথা আজ বহু আলোচিত, কিন্তু এই সমস্যাকে দেখার ভঙ্গী সব মানুষের সমান নয়। এই দেখার তফাত কিছুটা নির্ভর করে সম্পর্কের ওপরও।

অনেকেই বলেছেন চাকরি ছেড়ে চলে আসাটা কোনও উদাহরণ নয়, টাকা আসবে কোথা থেকে! চিকিৎসা করতে হবে। যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে পরিস্থিতিটা। যুক্তি অনেক সময় হার মেনে যায় আবেগের কাছে। আমার মায়ের বেলায় যা হয়েছিল। আমাদের ধৈর্য দেখে সবাই অবাক। ডাক্তার থেকে সিস্টার, হাসপাতালের সাধারণ কর্মী, সিকিউরিটি গার্ড, পেশেন্টের পরিবারের লোকজন, সবার একই কথা, আশি উর্দ্ধ মায়ের জন্য এরকম প্রতীক্ষা, অপেক্ষা যাই বলি না কেন তাঁরা দেখেননি। কিন্তু তাঁরা জানেন না এমন মানুষের জন্য অপেক্ষা করাই যায়, তিনি আর আমাদের সঙ্গে বেশিদিন নেই জেনেও! এই মায়েরই দেখভালে থাকত একদিন আমার সংসার, আমার অসুস্থ শাশুড়িকে তাঁর জিম্মায় ছেড়ে আমি কাজে বেরোতাম। সে মানুষ যখন বিপদে, নিদারুণ অসুস্থতায়, তাঁর জন্য বাড়িতে বসে আরাম বা বিশ্রাম করা হয়তবা যায় না!

নিউ জার্সির মেয়েটি ছাড়াও আরও অনেকে বসতেন হাসপাতালের অপেক্ষা গৃহে বা যে কোনও বসবার জায়গায়, শীতকাল বলে অপেক্ষা করতেন রোদে দাঁড়িয়ে।

এমনই একজনের স্ত্রীর স্পাইনাল কর্ডে একটা বড় অপারেশন হয়েছিল। নদীয়া থেকে আসতেন তিনি। মেয়ে আসত কাটোয়া থেকে। তার

শিশু সন্তান আর স্বামীকে নিয়ে। তাঁদের পক্ষে নিত্য আসা যাওয়া ছিল বড় কষ্টের। সল্টলেকে জিডি মার্কেটের কাছে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ভদ্রলোক প্রায়ই দুঃখ করতেন নিজের বাড়িঘর ছেড়ে তিনশ টাকা দিনে ভাড়া দিয়ে একটা রান্না ঘরে থাকি। যে বাড়িতে সল্টলেকে থাকতেন তার বাড়িওয়ালা পেশেন্ট পার্টির থাকার ব্যবস্থায় রান্নাঘরকে ঘর বানিয়েছেন! ভদ্রমহিলা এক মাসের ওপর ভর্তি! প্রথম দিকে ভাল হচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ অবস্থার অবনতি। জেনারেল ওয়ার্ডে সিস্টারদের বকুনি আর খারাপ ব্যবহারে নিজে কথা বলা বন্ধ করলেন। মেয়ে সিস্টারের কাছে প্রশ্ন তুললেন 'এই ব্যবহারের মানে কি'? যথারীতি সিস্টারদের অস্বীকার। বাক্‌বিতন্ডা। ভদ্রমহিলার অবস্থার আরও অবনতি, কখনও সোডিয়াম ফল করছে, সিস্টাররা বলছেন উনি ইচ্ছা করে খাবার খেতে চান না, কথা বলতে চান না। ডাক্তার বলছে ওনার অবস্থা যা তাতে জেনারেল বেডে রাখা যায় না, আই টি ইউ তে ট্রান্সফার করুন। এভাবেই চলছিল। হঠাৎ শোনা গেল ম্যানেনজাইটিস। তারপর একদিন মোটামুটি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। মা যখন মৃত্যু শয্যায়, ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আবার স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালের শরণাপন্ন! ভদ্রমহিলা সারারাত জেগে থাকেন, ভুল বকেন। আবার ভর্তি।

মা মারা গেলেন যে রাতে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮, ভদ্রলোককে দেখেছি রুটি তরকারি নিয়ে আই সি ইউতে যাচ্ছেন স্ত্রীকে খাওয়াতে। মেয়ে মায়ের কাছে অপেক্ষা করছে খাওয়াবার জন্য। এভাবেই চলে হাসপাতালের পেশেন্ট পার্টির লড়াই - বাড়ি যাওয়া আর আসা।

হাসপাতালে বসে থাকার অভিজ্ঞতায় দেখেছি একই রুগী ভর্তি হন বার বার। কেউ ন বার কেউ এগার বার কেউ চোদ্দ বার। আমার মা ভর্ত্তি হয়েছিলেন পনেরো বার। গত দুমাসে দুবার, চার মাসে পাঁচবার। পরিবার গুলো জেরবার, এতো শুধু অর্থনৈতিক প্রশ্ন নয়, শারীরিক মানসিক যে ধকল, যে চাপ যায় তা শুধু ভুক্তভোগীরাই জানেন।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লক থেকে আসত একটি ছেলে, ওর সাতান্ন বছরের শ্বশুর মশাই আই টি ইউ তে ভর্তি। কেবিনে ছিলেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত, কারণ শ্বশুর ছিলেন একেবারেই অচেতন, শরীরে কোনও সাড়া ছিল না। প্রায়ই হাসপাতালের অপেক্ষা গৃহে জামাইবাবুর সঙ্গে বসে থাকত। বলত ওর শাশুড়ি আই সি ডি এস কর্মী, জমি জমা আছে। এখনও জমিতে হাত পড়ে নি, এরপরে হয়ত বেচতে হবে। পরে একদিন দেখলাম ভদ্রলোক আই টি ইউতে নেই। শুনলাম জেনারেল ওয়ার্ডে শিফ্‌ট করা হয়েছে। ওঁরা আর খরচ টানতে পারছিলেন না। হঠাৎ একদিন ওঁদের কাছে হাসপাতাল থেকে ফোন গেল, ভদ্রলোকের জীবন সংশয়, আই টি ইউ তে শিফ্‌ট করতে হবে। বাড়ির লোক হাসপাতালে এসে ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরলেন, এখানেই রেখে যা হয় করুন। খরচ অত দিতে পারব না। ছেলেটির কাছে শুনেছি বাড়িতে কান্নার রোল! কিন্তু প্রশ্ন হল এই কান্না কি চিকিৎসা করাতে না পাবার কান্না, অনিশ্চয়তার কান্না! একটা অধিকার হারিয়ে যাবার কান্না। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে চিকিৎসার অধিকার টুকু মানুষকে দেওয়া যাচ্ছে না কেন? এত ব্যয়

হাসপাতালে বসে থাকার অভিজ্ঞতায় দেখেছি একই রুগী ভর্তি হন বার বার। কেউ ন বার কেউ এগার বার কেউ চোদ্দ বার। আমার মা ভর্ত্তি হয়েছিলেন পনেরো বার। গত দুমাসে দুবার, চার মাসে পাঁচবার।

বহুল চিকিৎসা ব্যবস্থা হওয়ার দরকার হল কেন? কার স্বার্থে এই ব্যয়বাহুল্য?

এক পুরুষ রুগীর ছেলে চিৎকার করে বলছিলেন সব রুগীকেই পর পর প্রায় একই চিকিৎসা। কুড়ি হাজার তিরিশ হাজারের অ্যান্টিবায়োটিক্স, ভেন্টিলেশন।

প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে দেওয়া ভাল আমি যে হাসপাতালের কথা বলছি সেটির নির্মাণ এবং পরিচালনা বিশেষ আদর্শ ও মতবাদের মানুষের দ্বারা হয়। তাঁরা দাবি করেন, তাঁরা মানুষের কথা বলেন ও ভাবেন। তবে? মৃত্যুর মুখোমুখি যে মানুষ দাঁড়িয়ে তাঁর চিকিৎসায় এত বাহুল্য হবে কেন?

কথা বলতে শুনেছি একটি ছেলেকে, বাবার পেসমেকার বসাতে হবে তার দাম নিচ্ছে বিভিন্ন জনের কাছে। টেন্ডার নেবার মতো। কম দামে যাতে হয়। এই ছেলেটির কিন্তু ক্ষমতা আছে, তার দাদা আছে। তবু কার্পণ্য! এক পক্ষ দেখছে চিকিৎসা কত কম খরচে হয়, আর এক পক্ষ দাম হাঁকছে বিশাল যা সাধারণের নাগালের বাইরে। চিকিৎসা পাওয়া যে একটা অধিকার তা অনেকেরই মাথায় নেই। পেশেন্ট পার্টিরও নেই।

ভদ্রমহিলার মা ভর্তি আছেন বেশ কিছু দিন হল, বায়পসি করতে বলেছে হাসপাতাল। খুব ভুল বকছেন। সিস্টারদের কাছে মার খেয়েছেন বলে অভিযোগ। একজন বয়স্ক রুগীকে সিস্টাররা মারছেন শুধুমাত্র তাঁর ভুল কথা বলা, চিকিৎসা নেওয়ার অনীহার জন্য! তাঁর ক্যানসার ধরা পড়ে।

সিস্টারদের গাফিলতি, তাঁদের খারাপ ব্যবহার প্রায় প্রতিজনের কাছে শোনা যায়। আর রাত বাড়লেই হাসপাতালের ফোন প্রায় সবারই অভিজ্ঞতা, বেশি দামি ওয়ার্ডে শিফ্ট করবার অনুমতি চেয়ে। কিন্তু অনেকেরই যেমন আমার মায়ের, সিস্টাররা যদি আগেই ডাক্তারদের নজরে আনতেন অসুস্থতা তাহলে হয়ত রাতে, আমাকে ডাক্তারকে বলতে হত না, ওনার অবস্থা খুব খারাপ আমরা আই টি ইউতে শিফট করতে পারি? শুধু রাতে রুগী চেঁচাচ্ছেন বলে ডাক্তারদের অগোচরে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, যাঁকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ!

অভিযোগ জানাতে শোনা গেল 'বিয়াল্লিশ জন সিস্টার সরকারি চাকরিতে চলে গেছে। আমরা কি করব? এখন যারা আছে তারা অত দক্ষ নয়।' কি অপূর্ব স্বীকারোক্তি! তার জন্য কি খরচ কিছু কমেছে? না। হোটেলের মতো ব্যবস্থায় হাসপাতাল চলছে।

তবে একথাও ঠিক হাসপাতালের কিছু সহৃদয় কর্মীর সহযোগীতায় এখনও কিছু বৃদ্ধ অসহায় একাকী মানুষ চিকিৎসা করাতে পারেন। হাসপাতালের চাতালে দরিদ্র মানুষ পড়ে থাকলে তুলে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান হয়। পেশেন্ট পার্টি নিকটাত্মীয়, তার মায়ের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা জেনে চোখের জল ফেললে সিস্টার তা মুছিয়ে দেন।

তবুও বলতে হয় এই সাহায্যকারী হাসপাতাল কর্মী, সিস্টারদের সংখ্যা কমছে। এটাই ভয়ের বিষয়। যতদিন যাচ্ছে সামগ্রিক সমাজের চরিত্র বদলের সাথে যে মানুষগুলির ওপর সেবার ভার তাঁরাও চরিত্র বদলাচ্ছেন, বড় অমানবিক হয়ে যাচ্ছে পুরো বিষয়টা।